সহায়ক পাঠ

কোনি

মতি নন্দী

বাংলা । প্রথম ভাষা

দশম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
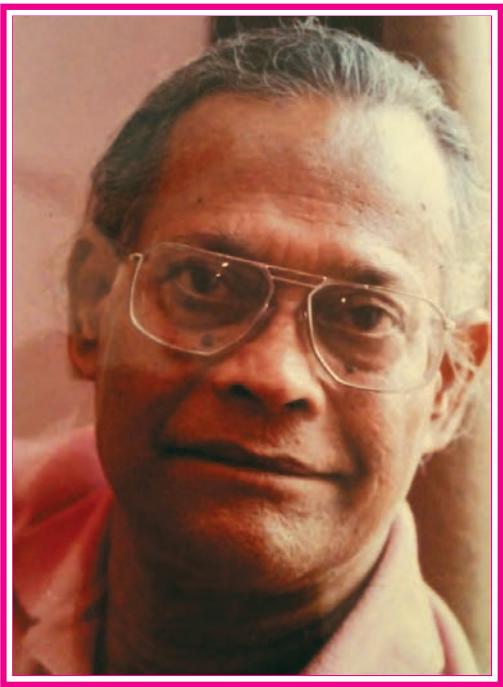
ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি মাধ্যমিক স্তরে ২০১৫ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসটি। অভিনব এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড.পার্থ চ্যাটার্জীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিল্পী সুব্রত মাজী বইটির আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। রূপায়ণের ক্ষেত্রে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ধন্যবাদ। আশা করা যায়, 'কোনি' উপন্যাসটি শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

মতি নন্দী (১৯৩১ — ২০১০)

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। জন্ম ১৯৩১ সালে, উত্তর কলকাতায়। খেলাধূলার সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বাংলা সাম্মানিকের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্প 'বেহুলার ভেলা' পাঠক মহলে সাড়া ফেলেছিল। পরবর্তীকালে বড়োদের জন্য এবং শিশু-কিশোরদের জন্য সমান দক্ষতায় গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা 'ক্রীড়াসাহিত্য' তাঁর হাতেই প্রাণ পেয়েছে। নিজস্ব ভাষাভঙ্গী, তীব্র বিদ্রূপ আর অবিস্মরণীয় শিল্পদৃষ্টি তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশু-কিশোরদের জন্য বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'স্ট্রাইকার', 'স্টপার', 'কোনি', 'ননীদা নট আউট', 'অপরাজিত আনন্দ', 'কলাবতী', 'শিবা' প্রভৃতি সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। ১৯৭৪ সালের আনন্দ পুরস্কার, ১৯৯১ সালে 'সাদা খাম' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার (২০০০)। তাঁর মতো সব্যসাচী লেখকের জুড়ি বিশ্বসাহিত্যে মেলা ভার।

মতি নন্দী ২ বিধান শিশু সরণি ∗ স্কাইলাইন ∗ ফ্ল্যাট নং ৪০৫
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

সূচনা-কথা

মতি নন্দীর ‘কোনি’ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মেয়ের কাহিনি। এতে আছে একটি মেয়ের নিরলস অধ্যবসায় ও সমস্যার সাথে মোকাবিলা করে নিজের উত্তরণ। লড়াই করে জিতে যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই বইটিকে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি এবং আমার পরিবারের সকলের কাছেই এটি খুশির বার্তা নিয়ে এসেছে।

ধন্যবাদান্তে,

১০ জুলাই ২০১৫

মতি নন্দী

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা

ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুব্রত মাজী

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

আজ বারুণী। গঙ্গায় আজ কাঁচা আমের ছড়াছড়ি।

ঘাটে থই থই ভিড়। বয়স্কদের ভিড়টাই বেশি। সদ্য ওঠা কাঁচা আম মাথার উপর ধরে, ডুব দিয়ে উঠেই ফেলে দিচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে আম। কেউবা দূ রে ছুড়ে ফেলছে।

ছোটো ছোটো দলে ছেলেরা জলে অপেক্ষা করে আছে আম সংগ্রহের জন্য। কেউ গলাজলে দাঁড়িয়ে,কেউবা দূরে ভেসে রয়েছে। আম দেখলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একসঙ্গে দু-তিনজন চিৎকার করতে করতে জল তোলপাড় করে এগিয়ে যায়। যে পায়, প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়, পকেটটা আমে ভরে গিয়ে ফুলে উঠলে জল থেকে উঠে ঘাটের কোথাও রেখে আসে। সেই আমে হাত দেওয়ার সাধ্য কারোর নেই। পরে আমগুলো ওরা বিক্রি করে পথের ধারে বসা বাজারে, অনেক কম দামে।

আজ গঙ্গায় ভাটা, জল অনেকটা সরে গেছে ঘাট থেকে। সিঁড়ি এবং তার দু-ধারে ইটবাঁধানো ঢালু পাড় শেষ হয়ে কিছুটা পলিমাটি, তারপর জল। স্নান করে কাদা মাড়িয়ে বিরক্ত মুখে উঠে আসতে হচ্ছে। তারপর অনেকে যায় ঘাটের মাথায়, ট্রেন লাইনের দিকে মুখ করে বসা বামুনদের কাছে, যারা পয়সা নিয়ে জামাকাপড় জমা রাখে, গায়ে মাখার সরষে বা নারকোল তেল দেয় এবং কপালে চন্দনের ছাপ আঁকে। রাস্তার একধারে বসা ভিখারিদের অনেকে উপেক্ষা করে, কেউ কেউ করে না। দু-ধারের ছোটো ছোটো নানান দেবদেবীর দুয়ারে এবং শিবলিঙ্গের মাথায় ঘটি থেকে গঙ্গাজল দিতে দিতে, কাঠের, প্লাস্টিকের, লোহার, খেলনার ও সাংসারিক সামগ্রীর দোকানগুলির দিকে কৌতূহলী চোখ রেখে অধিকাংশই বাড়ির দিকে এগোবে। পথের বাজার থেকে ওল বা থোড় বা কলম্বা লেবু ধরনের কিছু হয়তো কিনলেও কিনতে পারে। তারপর, রোদে তেতে ওঠা রাস্তায় খালি-পা দ্রুত ফেলে বাড়ি পৌঁছাবে বিরক্ত মেজাজে।

তেলচিটে একটা ছেঁড়া মাদুরে উপুড় হয়ে বিষ্টুচরণ ধরও দলাই-মালাই করাতে করাতে বিরক্ত মুখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। বিষ্টু ধর (পাড়ায় বেষ্টাদা) আই. এ. পাশ, অত্যন্ত বনেদি বংশের, খান সাতেক বাড়ি ও বড়োবাজারে ঝাড়ন মশলার কারবার এবং সর্বোপরি সাড়ে তিন মণ একটি দেহের মালিক। ওরই সমবয়সি চল্লিশ বছরের একটি বিশ্বস্ত অস্টিন সর্বত্র ওকে বহন করে।

বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হাত পনেরো দূরের একটা লোক। পরনে সাদা লুঙ্গি আর গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে রঙিন ঝোলা। তার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসছে। বিষ্টু বুঝতে পেরেছে, লোকটা হাসছে তার দেহের আয়তন দেখে। এরকম হাসি, বাচ্চা ছেলেরাও হাসে। বিষ্টু তখন দুঃখ পায়, তার ইচ্ছা করে ছিপছিপে হতে।

কিন্তু বিষ্টু বিরক্ত হচ্ছে যেহেতু এই লোকটা মোটেই বাচ্চা নয়। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মেশালে যেমন দেখায়, মাথার কদমছাঁট চুল সেই রঙের। বয়সটা পঞ্চাশের এধারে বা ওধারে বছর পাঁচেকের মধ্যে হতে পারে। লোকটার গায়ের রং ধুলোমাখা পোড়ামাটির মতো; আর চোখের চাহনি! ধূসর মণি দুটো দেখলে মনে হবে বোধহয় সূর্যের

দিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাকিয়ে থেকেই মণির কালো রংটা ফিকে হয়ে গেছে। চাহনিটা এমন, দেখলে মনে হয় যেন তার মনের সঙ্গে মেলে না সেইসব ব্যাপারগুলো ব্লোটর্চের মতো পুড়িয়ে দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। চোয়াল দুটোকে শক্ত করে ধরে আছে জেদ।

মালিশওলা ডান হাঁটুটা বিষ্টুর কোমরে চেপে ধরে মেরুদণ্ড বরাবর ঘাড় পর্যন্ত দ্রুত ওঠানামা করাতে লাগল পিস্টনের মতো। বার দশেক এইভাবে হাঁটু ব্যবহারের পর মালিশওলা নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু জোড়া করে বিষ্টুর পিঠে জোড়াতালুর কোদাল চালাল।

এরপর বিষ্টু চিত হবার চেষ্টা করল। পারছিল না, মালিশওলা ঠেলেঠুলে গড়িয়ে দিতেই সে অভীষ্ট লাভ করল। আব্রুরক্ষাকারী গামছাটি ঠিকঠাক করে বিষ্টু গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল, ‘‘তানপুরো ছাড়।’’

মালিশওলা দশ আঙুল দিয়ে বিষ্টুর সারা শরীরের চর্বিগুলো খপাখপ খামচে টেনে টেনে ধরে ছেড়ে দিতে লাগল।

‘‘তবলা বাজা।’’

মালিশওলা দশ আঙুল দিয়ে বিষ্টুর গলা থেকে কোমর অবধি ধপাধপ চাঁটাতে শুরু করল। চোখ বুঁজে প্রবল আরামে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে তার মনে হলো, লোকটা নিশ্চয় এখন ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। বিষ্টু তখন খুবই বিরক্ত বোধ করে বলল, ‘‘সারেগামা কর।’’

মালিশওলা নির্দেশ পেয়েই আঙুলগুলো দিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে লাগল বিষ্টুর সর্বাঙ্গে। আঙুলগুলো শরীরে কিলবিল করায় সুড়সুড়ি লাগছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় চর্বি থলথল করে কেঁপে উঠতেই বিষ্টু শুনল খুকখুক হাসির শব্দ।

চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু বলল, ‘‘এতে হাসির কী আছে, য়্যা?’’

সেকেন্ড কুড়ি পরে বিষ্টু জবাব শুনল, ‘‘ম্যাসেজ হচ্ছে না সংগীতচর্চা হচ্ছে?’’

‘‘যাই হোক না, তাতে আপনার কী?’’

‘‘ব্লাডপ্রেশারটার মেপেছেন?’’

‘‘আপনার দরকার?’’

‘‘ব্লাড সুগার পরীক্ষা করিয়েছেন? কোলেস্টেরল লেভেলটাও দেখেছেন কি?’’

‘‘কে মশাই আপনি, গায়ে পড়ে এত কথা বলছেন। চান করতে এসেছেন, করে চলে যান।’’

‘‘তা যাচ্ছি। তবে আপনার হার্টটা বোধহয় আর বেশিদিন এই গন্ধমাদন টানতে পারবে না।’’

‘‘কী বললেন!’’

বিষ্টু ধর উঠে বসার জন্য প্রথমে কাত হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটি তুলল। তারপর দু-হাতে মেঝেয় চাপ দিয়ে উঠে বসল।

লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘‘অবশ্য হাতি কিংবা হিপোর কখনো করোনারি অ্যাটাক হয়েছে বলে শুনিনি, সুতরাং আমি হয়তো ভুলও বলতে পারি।’’

বিষ্টু ধর রাগে কথা বলতে পারছে না, শুধু চোখ দিয়ে কামান দাগতে লাগল। লোকটি পাঞ্জাবি খুলল। লুঙ্গি খুলল। ভিতরে হাফ প্যান্ট।

অবশেষে বিষ্টু ধর কোনোক্রমে বলল, ‘‘আপনাকে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।’’

‘‘আমার বউ ঠিক এই কথাই বলে।’’

‘‘আপনি একটা ন্যুইসেন্স।’’

‘‘আমার ক্লাবের অনেকে তাই বলে।’’

‘‘আপনার মতো লোককে চাবকে লাল করা উচিত।’’

লোকটি আবার ছেলেমানুষের মতো পিটপিট করে তাকাল।

‘‘আচ্ছা, আমি যদি আপনার মাথায় চাঁটি মারি, আপনি দৌড়ে আমায় ধরতে পারবেন?’’

কথাগুলো বলেই লোকটি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছোটার ভঙ্গিতে জগিং শুরু করল। অনেকে তাকাল, অনেকে ভাবল পাগল।

বিষ্টু হতভম্ভ হয়ে লোকটির জগ করা দেখতে লাগল। চাঁটি মারার ভঙ্গিতে হাতটা তুলে লোকটি হঠাৎ বিষ্টুর দিকে ছুটে এল। বিষ্টু ডুব দেওয়ার মতো মাথাটা নীচু করল। লোকটি হাত তুলে রেখেই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"পারবেন ধরতে যদি চাঁটিয়ে যাই? আমার কিন্তু আপনার থেকে অনেক বয়েস।"

জগ করতে করতে লোকটি আবার এগিয়ে আসছে। বিষ্টু ধর বুনো মোষের মতো তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। তাইতে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে শরীরটাকে পেন্ডুলামের মতো ডাইনে এবং বামে দুলিয়ে তিড়িং তিড়িং লাফালাফি শুরু করল। বিষ্টু থাবার মতো দুটো হাত তুলে অপেক্ষা করছে। দৃশ্যটা অনেককে আকৃষ্ট করল।

"আমি রোজ একসারসাইজ করি। আইসোমেট্রিক, ক্যালিসথেনিক, বারবেল, বুঝলেন রোজ করি। দারুণ খিদে পায়। আপনার পায়?"

বিষ্টু ধর কথা না বলে শুধু 'ঘোঁৎ' ধরনের একটা শব্দ করল।

"খিদের মুখে যা পাই তাই অমৃতের মতো লাগে। এই সুখ আপনার আছে?"

উত্তরের অপক্ষো না করেই লোকটি জগ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে শেষ ধাপ পর্যন্ত গিয়ে আবার উঠে এল।

তিনবার এইভাবে ওঠানামা করে সে বিষ্টু ধরের পাঁচ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। হাত দুটো নামিয়ে বিষ্টু তখন খানিকটা দিশাহারার মতোই লোকটির কাণ্ড দেখছিল। ওর চোখে এখন রাগের বদলে কৌতূহল। মনে মনে সে ছিপছিপে শরীরটার সঙ্গে নিজের স্থূলত্ব বদলাবদলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

"খাওয়ায় আমার লোভ নেই। ডায়েটিং করি।" ভারিক্কি চালে বিষ্টু ধর ঘোষণা করল এবং গলার স্বরে বোঝা গেল এর জন্য সে গর্বিত।

লোকটি দু'পা এগিয়ে এসে বলল, "কী রকম ডায়েটিং!"

"আগে রোজ আধ কিলো ক্ষীর খেতুম, এখন তিনশো গ্রাম খাই; জলখাবারে কুড়িটা নুচি খেতুম এখন পনেরোটা; ভাত খাই মেপে আড়াইশো গ্রাম চালের; রাতে রুটি বারোখানা। ঘি খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি গরম ভাতের সঙ্গে চার চামচের একবিন্দুও বেশি নয়। বিকেলে দু-গ্লাস মিছরির সরবত আর চারটে কড়াপাক। মাছ-মাংস ছুঁই না, বাড়িতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছে। আর হপ্তায় একদিন ম্যাসেজ করাই এখানে এসে। আমার অত নোলা নেই, বুঝলেন সংযম কেচ্ছাসাধন আমি পারি। হার্টের ব্যামো-ফ্যামো আমার হবে না, বংশের কারো হয়নি। বাজি ফেলে সত্তরটা ফুলুরি খেয়ে কলেরায় বাবা মারা গেছে, জ্যাঠা গেছে অম্বলে।"

"এত কেচ্ছাসাধন করেন! বাঁচবেন কী করে?"

লোকটি এগিয়ে এসে বিষ্টু ধরের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দিল।

"আঃ, সুড়সুড়ি লাগে," বিষ্টু হাতটা সরিয়ে দিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বলল, "আমার বউ ওই কথা বলে। সকাল থেকে রাত অবধি ব্যবসা দেখি। সরষে, চিনি, ডাল নানান জিনিসের কারবার। এত খাটুনির পর এইটুকু খাদ্য! তারপর এই অপমান।"

"কে করল?"

লোকটি আবার হাত বাড়াতেই বিষ্টু এক পা পিছিয়ে বলল,

"না, সুড়সুড়ি লাগে।"

" কে অপমান করল?"

‘‘কেন, আপনি হাতি-হিপো বললেন না! জলহস্তির ইংরিজি হিপো তা কি আমি জানি না, আমি কি অশিক্ষিত?’’

‘‘না না, আমি আপনাকে অশিক্ষিত তো বলিনি।’’ লোকটি বিব্রত হয়ে চশমা মুছতে মুছতে বলল, ‘‘আপনার ওজনটা খুব বিপজ্জনক হার্টের পক্ষে।’’

‘‘বিপজ্জনক মানে?’’ বিষ্টু ধর তাচ্ছিল্য প্রকাশের চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত স্বর। ‘‘আমি কি মরে যেতে পারি!’’

‘‘তা পারেন। আর নয়তো কেচ্ছাসাধনের কষ্ট করতে করতে, রোগে ভুগে ভুগে বেঁচে থাকবেন কয়েকটা বছর।’’

বলেই লোকটি দু-হাত তুলে সামনে ঝুঁকে পিঠটা ধনুকের মতো বেঁকাল। হাতের আঙুল পায়ে ছুঁইয়ে আবার সিধে হলো।

‘‘আপনি আমার থেকে চার হাজার গুণ বড়োলোক, কিন্তু চার লক্ষ টাকা খরচ করেও আপনি নিজে শরীরটাকে চাকর বানাতে পারবেন না।’’

‘‘কী রকম! কী রকম!’’

লোকটি তার ডান কনুই শরীরে লাগিয়ে পিস্তল ধরার মতো হাতটা সামনে বাড়াল।

‘‘এইবার আমার হাতটা নামান তো।’’

অবিশ্বাসভরে বিষ্টু ধর হাতটার দিকে তাকাল। শিরা উপশিরা গাঁটসমেত হাতটাকে শুকনো শিকড়ের মতো দেখাচ্ছে।

‘‘নামান নামান।’’

ফুলো ফুলো আঙুল দিয়ে বিষ্টু লোকটার কবজি চেপে ধরে নীচের দিকে চাপ দিল। নড়ল না এক সেন্টিমিটারও। ঠোঁট কামড়ে বিষ্টু জোরে চাপ দিল। হাতটা একই জায়গায় রয়েছে। বিষ্টু এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। কপালে ঘাম ফুটছে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। তাদের চোখে বিস্ময়, লোকটার সাফল্যে না বিষ্টুর ব্যর্থতায় বোঝা যাচ্ছে না। বিষ্টু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে পাতলা হাসি আর চোখ পিটপিটানি দেখতে পেল। হাতটা সে নীচে নামাতে পারছে না। বিষ্টু হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

‘‘কী করে পারলেন!’’

‘‘জোরে বলতে শুধু গায়ের জোরই বোঝায় না। মনের জোরেই সব হয়। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শরীরের দুর্বলতা ঢাকা দেওয়া যায়। শরীর যতটা করতে পারে ভাবে, তার থেকেও শরীরকে দিয়ে বেশি করাতে পারে ইচ্ছার জোর। সেজন্য শুধু শরীর গড়লেই হয় না, মনকেও গড়তে হয়। শরীরকে হুকুম দিয়ে মন কাজ করাবে। আপনার মন হুকুম করতে জানে না তাই শরীর পারল না।’’

বিষ্টু ধর বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে বলল, ‘‘ইচ্ছে করে খুব রোগা হয়ে যাই।’’

ঠিক এই সময়ই গঙ্গার তীর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল, ‘‘কো ও ও ও ... নি ই ই ই। কো ও ও ও... নি ই ই ই।’’

লোকটি গঙ্গার দিকে তাকাল।

গঙ্গায় একটা আম ভেসে চলেছে ভাটার টানে। তিনজন সাঁতরাচ্ছে সেটাকে পাবার জন্য। কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু-তিনটি বছর চোদ্দো-পনেরোর ছেলে জল থাবড়ে হইচই করে ওদের তাতিয়ে তুলছে। সমানে-সমানে ওরা যাচ্ছে মাথা তিনটে দু-ধারে নাড়াতে নাড়াতে, কনুই না ভেঙে সোজা হাত বৈঠার মতো চালিয়ে ওরা আমটাকে তাড়া করেছে।

হঠাৎ ওদের একজন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করল, অন্য দু-জনকে পিছনে ফেলে। তখনই চিৎকার উঠল — ‘‘কো ও ও ও...নি ই ই ই। কো ও ও ও...নি ই ই ই।’’ পিছিয়ে পড়া দু-জনও গতি বাড়াল।

আমটা প্রায় প্রথম ছেলেটির মুঠোয় এসে গেছে। হঠাৎ সে থমকে গেল। হাত ছুড়ছে কিন্তু এগোল না। বার দুয়েক তার মাথাটা জলে ডুবল। তারপর সে রাগে চিৎকার করে ঘুরে গিয়ে লাথি ছুড়ল।

ততক্ষণে পিছন থেকে একজন ওকে অতিক্রম করে আমটা ধরে ফেলেছে।

‘‘পা টেনে ধরেছিল।’’ বিষ্টু ধর বলল।

লোকটি হেসে চশমাটা খুলে ঝোলায় রাখল। ঘাটের বাইরের দিকে সেখানে কয়েকজন উড়িয়া ব্রাহ্মণদের একজনের কাছে ঝোলাটা রেখে এসে, লোকটি অতি সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। চশমা ছাড়া, মনে হচ্ছে, লোকটি যেন অন্ধ।

জলের কিনারে কাদার উপর তখন মারামারি হচ্ছে, একজনের সঙ্গে দু-জনের। কাদা ছিটকোচ্ছে। লোকেরা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে সরে গেল। দু-তিনটি ছেলে ওদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

‘‘ঠিক হ্যায়, চালা, আরো জোরে।’’

পা থেকে মাথার চুল কাদায় লেপা কঞ্চির মতো সরু চেহারাটা তার লম্বা হাত দুটো এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। অন্য দুজন সেই বিপজ্জনক বৃত্তের বাইরে কুঁজো হয়ে তাক খুঁজছে।

‘‘ফাইট কোনি ফাইট। চালিয়ে যা বক্সিং।’’

দু-জনের একজন পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। পড়ে গেল দু-জনেই।

‘‘অ্যাই অ্যাই ভাদু, চুল টানবি না কোনির। তাহলে কিন্তু আমরা আর চুপ করে থাকব না।’’

কোনির পিঠের ওপর বসা ভাদু চুল ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে কোনির মাথা ধরে, কাদায় মুখটা ঘষে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কোনি পা ছুড়ল।

কোমরে চাড় দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। তারপর ঝটকা দিয়ে ভাদুর ডান হাতটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কামড়ে ধরল দুটো আঙুল।

চিৎকার করে ভাদু লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাদুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

‘‘খুবলে নোব তোর চোখ, বার কর আম। আমাকে চোবানো! পুঁতে রাখব তোকে এই গঙ্গামাটিতে। হয় আম দিবি নয় চোখ নোব।’’

দু-হাতের দশটা আঙুল ইগলের নখের মতো বেঁকিয়ে চিত হয়ে পড়া ভাদুর চোখের সামনে কোনি এগিয়ে আনতেই, দু'টি ছেলে ওকে ঠেলে সরিয়ে আনল।

"ছেড়ে দে চণ্ডু, হাত ছাড় কান্তি। শোধ নিয়ে ছাড়ব। আমাকে চোবানো?"

কোনির ঠোঁটের কোণে ফেনা, সামনের দাঁত হিংস্রভাবে বেরিয়ে রয়েছে। হিলহিলে লম্বা দেহটা সামনে-পিছনে দুলছে কেউটের ফণার মতো।

"এই ভাদু ও আম কোনির। বার করে দে। নয়তো সত্যিই চোখ তুলে নেবে কিন্তু।"

ভাদু ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে দেখছিল। শিউরে উঠে বলল, "রক্ত বেরোচ্ছে! দাঁত বসিয়ে গত্তো করে দিয়েছে।"

কোনির হাত ছেড়ে দিয়ে কান্তি এগিয়ে এসে ভাদুর প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। কয়েকটা কাঁচা আম বার করে, বড়োটি বেছে নিয়ে কোনির দিকে ছুড়ে দিল।

লুফে নিয়েই কোনি কামড় বসাল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত মুখে বলল, "কী টক রে বাবা। মা গঙ্গাকে এমন আমও খেতে দেয়!"

আমটা জলে ছুড়ে দিয়ে সে মুখ থেকে ছিবড়ে ফেলতে ফেলতে ভাদুর কাছে এলো।

"দেখি তো কেমন গত্তো হয়েছে।"

খপ করে ভাদুর হাতটা ধরে সে ভ্রূ কুঁচকে আঙুলটা তুলে দেখল।

"ভাগ্, কিচ্ছু হয়নি। নাম্ নাম্ জলে নাম্। যেমন কাজ করেছিস তেমনি ফল পেয়েছিস। আমাকে রাগালে কী হয়, এবার বুঝলি তো।"

কয়েকটি ডুব দিয়ে লোকটি কোমরজলে দাঁড়িয়ে গামছা ঘষছিল পিঠে। কানে এল পাশের এক বৃদ্ধের আপনমনের গজগজানি।

"জ্বালিয়ে মারে হতভাগারা। গঙ্গার ঘাটটাকে নোংরা করে রেখেছে হাঘরে হাভাতের দল। মা গঙ্গাকে উচ্ছুগ্গো করা আমই রাস্তায় বসে বেচবে। জুটেছে আবার এক মেয়েমদ্দানি বাপ-মাও কিছু বলে না।"

লোকটি আবার ডুব দিতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল।

"মেয়েমদ্দানিটা কে!"

"কে আবার দেখতে পাননি, চোখ তো একজোড়া রয়েছে।"

লোকটি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। চশমাছাড়া ঝাপসাভাবে দেখল, ভাদুর হাত ধরে কোনি টানাটানি করছে। কাদামাখা কোনির মধ্য দিয়ে এক একবার একটি মেয়ে ফুটে ফুটে উঠছে যেন। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কাদামাখা চুল মাথায় বসে। প্যান্টে গোঁজা গেঞ্জি শরীরের সঙ্গে লেপটে দ্বিতীয় পরত চামড়া হয়ে আছে। দীর্ঘ সরু দেহ। সরু পা, সরু হাত। লোকটি ঠাওর করতে পারছে না, কোনি ছেলে কী মেয়ে।

দুটো ঢেউ পর পর লোকটিকে ধাক্কা দিল। বিষ্টু ধর জলে নেমেছে।

"আচ্ছা শরীরটাকে চাকর বানানো, সেটা কী ব্যাপার?"

"সোজা ব্যাপার। লোহা চিবিয়ে খেয়ে হুকুম করবেন হজম করো, পাকস্থলী হজম করবে। বলবেন পাঁচ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে চলো, পা জোড়া অমনি পৌঁছিয়ে দেবে। সখ হলো গাছের ডাল ধরে ঝুলবেন, হাত দুটো আপনাকে ঝুলিয়ে রেখে দেবে। এইসব আর কী।"

লোকটি জল থেকে উঠে আলতোভাবে মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়িতে দাঁড়াল। ভিজে গামছাটা নিংড়ে পায়ে লাগা মাটি ধুয়ে গঙ্গার দিকে তাকাল। ঝাপসাভাবে দেখল, পাড়ের কাছে জলে কিলবিল করছে মানুষ। তার মধ্যে কোনিকে চিনে নেওয়া সম্ভব হলো না।

লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে, ঝোলা কাঁধে চশমা মুছতে মুছতে লোকটি একবার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল, চশমা চোখে দিয়ে পাড়ের ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল, হঠাৎ নজরে এল গঙ্গার বুকে চারটি কালো ফুটকি। তারা সিকি গঙ্গা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

লোকটি আপনমনে একবার বলল: ‘‘কোনি। কো ও ও নি।’’

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভিজে গামছাটি পাগড়ির মতো মাথায় জড়িয়ে লোকটি বাড়ির পথে রওনা হলো।

মিনিট পনেরো পর সরু গলির মধ্যে একতলা টালির চালের একটি বাড়িতে লোকটি ঢুকল। সদর দরজার পরই মাটির উঠোন। টেনেটুনে একটি ভলিবল কোর্ট তাতে হয়ে যায়। লঙ্কা পেঁপে, জবা থেকে চালকুমড়ো পর্যন্ত, উঠোনটা নানান গাছে দখল হয়ে আছে। একদিকে টিনের চালের রান্নাঘর ও কলঘর আর একদিকে দালান ও তার পিছনে দুটি ঘর। একতলা বাড়িটি চারদিকের উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে খুব শান্তভাবে যেন উবু হয়ে বসে। উত্তর দিকে বাড়ির মালিক হলধর বর্ধন এই একতলা বাড়িটি কেনার জন্য বার দুয়েক প্রস্তাব করেছে, কিন্তু লোকটি সংসারে যার স্ত্রী এবং দুটি বিড়াল ছাড়া আর কেউ নেই, বিনীতভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করে।

বাড়ির কলে জল আসে সামান্য। লোকটির স্ত্রীর নাম লীলাবতী। জল খরচ করাটা লীলাবতীর সখ, বিড়াল পোষার মতোই। ফলে লোকটিকে স্নান করার জন্য প্রায়ই রাস্তার টিউবওয়েলটির সাহায্য নিতে হয়। আজ সকাল থেকে টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে না। তাই বহুকাল পর সে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে উঠোনে টাঙানো তারে ভিজে প্যান্টটা মেলেছে, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঢলঢলে প্যান্ট পরা বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট একজন।

‘‘ক্ষিদ্দা, তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছি, আর বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। দোকান থেকে কে বউদিকে ডাকতে এসেছিল, ‘আসছি’ বলে সেই যে গেছে —’’

‘‘ভেলো, চটপট একটু চা বানা দেখি।’’

‘‘বউদি যদি এসে পড়ে!’’

ক্ষিদ্দা অর্থাৎ ক্ষিতীশ সিংহ কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, ‘‘তাহলে থাক, বরং তুই কী জন্যে এসেছিস বল?’’

‘‘ক্লাবের আজকের মিটিংয়ে যাবে নাকি?’’

‘‘নিশ্চয় যাব ছেলেরা খাটবে না, ডিসিপ্লিন মানবে না, জলে নেমে শুধু ইয়ারকি ফাজলামো করবে। এসব ছেলেদের ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে বলাটা কি এমন দোষের! একজনও কি তাই নিয়ে কিছু ভাবে? আর ক্ষিতীশ সিঙ্গি কী বলল অমনি তাই নিয়ে কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হলো।’’

‘‘সেজন্য তো নয়, আসলে হরিচরণদা আর তার গ্রুপটির রাগ আছে তোমার ওপর। ওরাই শ্যামল আর গোবিন্দকে উসকে তোমার এগেনস্টে চার্জ আনিয়েছে।’’

‘‘আমি তা জানি। হরিচরণের বহুদিনের ইচ্ছে চিফ্ ট্রেনার হওয়ার। আমাকে বলেওছিল গত বছর। আমি বলেছিলুম, হরি, একটা চ্যাম্পিয়ন শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ট্রেনিং দিয়েই তৈরি করা যায় না রে। তার মন-মেজাজ বুঝে তাকে চালাতে হয়। ট্রেনারকে মনস্তাত্ত্বিক হতে হবে, তার মানে কমনসেন্স প্রয়োগ করতে হবে। গুরুকে শ্রদ্ধেয় হতে হবে শিষ্যের কাছে। কথা, কাজ, উদাহরণ দিয়ে মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বাসনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাকে মোটিভেট করতে হবে। এসব তোর দ্বারা সম্ভব নয়। তুই শুধু চেঁচামেচি গালাগালি করেই খাটাতে চাস, চিফ্ ট্রেনার হওয়া তোর কম্মো নয়।’’

‘‘ক্ষিদ্দা, তোমার এই লেকচার দেবার বদ অভ্যেসটা ছাড়ো। এককথায় যেখানে কাজ হয়, তুমি সেখানে দশ কথা বলো। হরিচরণদাকে অত কথা বলার কী দরকার ছিল। যাক্‌গে, আজ তুমি মিটিংয়ে যেও না, ওরা ঠিক করছে তোমাকে অপমান করবে।’’

‘‘করে করবে।’’ এই বলে ক্ষিতীশ তার পায়ে মাথা ঘষায় ব্যস্ত বিশুকে কোলে তুলে গলা চুলকে দিতে লাগল। চোখ বুঁজে বিশু ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শুরু করল।

‘‘তাহলে যাবেই!’’ নেমে যাওয়া প্যান্ট এবং কণ্ঠস্বর হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে তুলে ভেলো বলল।

ক্ষিতীশ ঘরের দিকে যেতে যেতে অস্ফুটে বলল, ‘‘হুঁ।’’

তখনই বাড়িতে ঢুকল লীলাবতী সিংহ। অতি ছোট্টখাট্ট, গৌরবর্ণা এবং গম্ভীর। পায়ে চটি, হাতে ছাতা। দু-জনের দিকে তাকিয়ে অবশেষে ভেলোকে বলল, ‘‘বেলা অনেক হয়েছে, চাট্টি ভাত খেয়ে যেও।’’

ভেলোর হঠাৎ যেন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ঘড়ি দেখেই ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘‘না না বউদি, ইস্‌স্ বড্ড দেরি হয়ে গেল, বাড়িতে ভাত নিয়ে বসে আছে। আমি এখন যাই। ক্ষিদ্দা, তোমার কিন্তু না গেলেই ভালো।’’

ভেলো চলে যেতেই লীলাবতী প্রশ্ন করল ক্ষিতীশকে ‘‘না গেলেই ভালো মানে?’’

‘‘আজ ক্লাবের একটা মিটিং আছে। ও বলছে সেখানে আমাকে নাকি কেউ কেউ অপমান করবে যাতে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে যাই।’’

‘‘তাহলে তো ভালোই হয়। ক্লাব-ক্লাব করে তো কোনোদিন ব্যবসা দেখলে না। আমি মেয়েমানুষ, আমাকেই কিনা দোকান দেখতে হয়। নেহাত ছেলেপুলে নেই তাই। যদি ক্লাব তোমায় তাড়ায় তাহলে আমি বেঁচে যাই।’’

লীলাবতী রান্নাঘরে ঢুকল। ক্ষিতীশ বিষণ্ণ চোখে দালানে বসে বিশুর মাথায় আনমনে হাত বোলাতে লাগল। এই সময় খুশি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডন দিয়ে, হাই তুলে ধীরে ধীরে সে চামরের মতো কালো লেজটি উঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল ক্ষিতীশের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে।

‘‘কই এসো।’’ রান্নাঘর থেকে ডাক এল।

ক্ষিতীশ অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে গিয়ে ভাত খেতে বসল।

খাওয়ার আয়োজন সামান্য। রান্না হয় কুকারে। প্রায় সবই সিদ্ধ। এটা খরচ, সময় ও শ্রম সংক্ষেপের জন্য নয়। ক্ষিতীশ বিশ্বাস করে, বাঙালিয়ানা রান্নায় স্বাস্থ্য রাখা চলে না। এতে পেটের বারোটা বাজিয়ে দেয়। সেইজন্যই বাঙালিরা শরীরে তাগদ পায় না, কোনো খেলাতেই বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না। খাদ্যপ্রাণ যথাসম্ভব অটুট থাকে সিদ্ধ করে খেলে এবং সর্বাধিক প্রোটিন ও ভিটামিন পাওয়া যায় এমন খাদ্যই খাওয়া উচিত।

প্রথম দিকে লীলাবতী বিদ্রোহী হয়েছিল, সরষেবাটা, শুকনো লঙ্কাবাটা, পাঁচফোড়ন, জিরে, ধনে প্রভৃতি বস্তুগুলি রান্নায় ব্যবহারের সুযোগ হারিয়ে। তুমুল ঝগড়া এবং তিনদিন অনশন সত্যাগ্রহেও কাজ হয়নি। ক্ষিতীশ তার সিদ্ধান্তে গোঁয়ারের মতো অটল থাকে। তার এক কথা: 'শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়।' অবশেষে লীলাবতী সপ্তাহে একদিন সরষে ও লঙ্কাবাটা ব্যবহারের অনুমতি পায়, শুধুমাত্র নিজের খাবারের জন্য। ক্ষিতীশ কখনো যজ্ঞিবাড়ির নিমন্ত্রণে যায় না। ক্লাবের ছেলেমেয়েদের সে প্রায়ই শোনায়: 'ডাক্তার রায় বলতেন, বিয়ে বাড়ির এক একটা নেমন্তন্ন খাওয়া মানে এক এক বছরের আয়ু কমে যাওয়া। বড়ো খাঁটি কথা বলে গেছেন।'

ক্ষিতীশ কথা না বলে খাওয়া শেষ করল।

ও যে রাগ করেছে লীলাবতী বুঝতে পেরেছে। বলল, ''ক্লাব থেকে তাড়াবে কেন? কী দোষ করলে?''

ক্ষিতীশ পালটা প্রশ্ন করল, ''তুমি এখন আবার দোকানে গেছলে কেন?''

গ্রে স্ট্রিটে ট্রামলাইন ঘেঁষে একফালি ঘরে দোকানটি। নাম 'প্রজাপতি'। আগে নাম ছিল 'সিন্হা টেলারিং'। দুটি দর্জিতে জামা-প্যান্ট তৈরি করত, আর দেয়াল আলমারিতে ছিল কিছু সিন্থেটিক কাপড়। ক্ষিতীশ তখন দোকান চালাত। দিনে দু-ঘন্টাও দোকানে বসত না। দুপুর বাদে তাকে সর্বদাই পাওয়া যেত জুপিটার সুইমিং ক্লাবে। তারপর একদিন সে আবিষ্কার করল আলমারির কাপড় অর্ধেকেরও বেশি অদৃশ্য হয়েছে, দোকানের ভাড়া চার মাস বাকি এবং লাভের বদলে লোকসান শুরু হয়েছে।

তখনই লীলাবতী হস্তক্ষেপ করে, দোকানের দায়িত্ব নেয়। টেলারিং ডিপ্লোমা পাওয়া দুটি মহিলাকে নিয়ে সে দোকানটিকে ঢেলে সাজায় নিজের গহনা বাঁধা দিয়ে। নাম দেয় 'প্রজাপতি'। পুরুষদের পোশাক তৈরি বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র মেয়েদের এবং বাচ্চাদের পোশাক তৈরি করে। দোকানে পুরুষ কর্মচারী নেই এবং চার বছরের মধ্যেই 'প্রজাপতি' ডানা মেলে দিয়েছে। আগে তিনদিনে ব্লাউজ তৈরি করে দেওয়া হতো, এখন দশদিনের আগে সম্ভব হচ্ছে না। লীলাবতী তার গহনাগুলির অর্ধেকই ফিরিয়ে এনেছে।

''এখন তো আর জায়গায় কুলোয় না, তাই বড়ো ঘর খুঁজছি। হাতিবাগানের মোড়ে একটা খোঁজ পাওয়া গেছে। আমাদেরই এক খদ্দেরের বাড়ি। বাড়ির গিন্নি এসেছিল মেয়ের ফ্রক করাতে। তাই গেছলুম কথা বলতে।'' লীলাবতী এঁটো থালাটা টেনে নিয়ে তাতে ভাত বেড়ে ডাল মাখতে মাখতে বলল।

ক্ষিতীশের প্রবল আপত্তি ছিল তার খাওয়া থালায় লীলাবতীর খাওয়ায়। 'আনহাইজিনিক। এইসব কুসংস্কারেই বাঙালি জাতটা গোল্লায় গেল।' এই বলে ক্ষিতিশ তর্ক শুরু করেছিল। কিন্তু লীলাবতী যখন অতিরিক্ত ঠান্ডা স্বরে বলল, 'এটা আমার ব্যাপার, মাথা ঘামিও না।' তখন মুহূর্তে বুঝে যায় আর কথা বাড়ালে তাকেই গোল্লায় যেতে হবে। তবে ক্ষিতীশ তার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। লীলাবতীর খাওয়ার সময় তাই কখনোই সে সামনে থাকে না।

শোবার ঘরের দেয়ালে ক্ষিতিশের বাবা-মা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ এবং ম্যাগাজিন থেকে কেটে বাঁধানো মেডেল গলায় ডন শোলান্ডার ও ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দু-হাত তুলে দাঁড়ানো ডন ফ্রেজারের ছবি, পাশাপাশি টাঙানো। এছাড়া আছে — সাধারণত যা থাকে — খাট, আলমারি, বাক্স, আলনা এবং টুকিটাকি সাংসারিক জিনিস। পাশের ঘরে বই, ম্যাগাজিন, একটা তক্তপোশ এবং তার নীচে ট্রেনিংয়ের জন্য রবারের দড়ি, স্প্রিং, লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এই ঘরে ক্ষিতীশ দুপুরে এক ঘণ্টা ঘুমোয়। পাখা নেই, বিছানা নেই। ওর মতে, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে শিষ্যকেই নয়, গুরুকেও কঠোর জীবনযাপন করতে হবে। অবশ্য তার কোনো শিষ্য নেই।

তক্তপোশে শুয়ে চোখ বুঁজে ক্ষিতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শিষ্য কোথায়!

ঘুম আসার ঠিক আগের মুহূর্তে, ক্ষিতীশের আবছায়া চেতনায় ফুটে উঠল লম্বা দুটো হাত বৈঠার মতো গঙ্গার জলে উঠছে আর পড়ছে।

মিলিয়ে গিয়ে নতুন আর একটি ছবি সে দেখল। ফণা তোলা কেউটের মতো হিলহিলে কাদায় লেপা সরু একটা দেহ। লম্বা লম্বা হাত এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। 'ফাইট কোনি, ফাইট।'

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ক্ষিতীশ অকারণেই অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ''কো ও ও নি।''

সম্ভবত নামটা তার ভালো লেগেছে।

টেবল টেনিস বোর্ডটায় কাপড় বিছিয়ে টেবল। সেটা ঘিরে সাতজন বসে। তার মধ্যে একটি চেয়ার খালি। ওরা চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ঘরের বাইরে কয়েকটি ছেলে, কার যেন প্রতীক্ষায়।

জুপিটার সুইমিং ক্লাবের নতুন প্রেসিডেন্ট এবং এম এল এ বিনোদ ভড়, ডানদিকে ঝুঁকে সম্পাদক ধীরেন ঘোষকে বলল, ‘‘একটাই অ্যাজেন্ডা, না আরো আছে?’’

ধীরেন ঘোষ তার সরু গলাটি যথাসম্ভব লম্বা করে চশমার নীচের অংশের প্লাস পাওয়ারের মধ্য দিয়ে টেবলে রাখা কাগজের দিকে তাকাল।

‘‘মেন আইটেম একটাই, আর যা আছে তা খুবই মাইনর।’’

‘‘কোরাম হয়েছে তো?’’

‘‘হ্যাঁ, সবাই হাজির।’’ ধীরেন ঘোষ এরপর ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘‘জগু, চা-সন্দেশ দিতে বল।’’

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাত্র, তখনই দরজাটা খুলে গেল। ক্ষিতীশ সিংহ ঘরের প্রতিটি লোকের মুখে উপর চোখ বুলিয়ে, প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি খালি চেয়ারটায় বসার আগে সভাকে নমস্কার জানাল।

জগু জিজ্ঞাসু চোখে ধীরেন ঘোষের দিকে তাকাল, মাথা হেলিয়ে ধীরেন ঘোষ বলল, ‘‘একটু পরে আনবি।’’

‘‘আমার দেরি হয়ে গেল।’’ ক্ষিতীশ ফিকে হেসে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল।

‘‘না না, মিনিট চারেক মাত্র দেরি হয়েছে।’’ বিনোদ ভড় ঘড়ি দেখে ধীরেন ঘোষকে বলল, ‘‘আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।’’

‘‘নিশ্চয় নিশ্চয়, এখুনি শুরু করছি। বেশিক্ষণ লাগার মতো কিছুই নেই, শুধু সুইমারদের চিঠিটা ছাড়া। আর সেটা আগেই সারকুলেট করা হয়েছে, সুতরাং নতুন করে বলার কিছু নেই।’’

‘‘হ্যাঁ আছে।’’

সবাই ক্ষিতীশের দিকে তাকাল।

‘‘আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই। সেগুলো জানতে চাই।’’

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বিনোদ ভড় বলল, ‘‘ধীরেনবাবু, ওর বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ উঠেছে সেগুলো তাহলে বলুন।’’

ধীরেন ঘোষ বিব্রতভাবে হরিচরণ মিত্তিরের দিকে তাকাল, হরিচরণ নড়ে-চড়ে বসল।

‘‘ক্ষিদ্দা সম্পর্কে অভিযোগ ছেলেদের মানে সুইমারদের। যারা সাত বছর, আট বছর আমাদের ক্লাবের হয়ে বিভিন্ন কম্পিটিশনে নামছে, মেডেল আনছে। মানে, আমাদের মুখোজ্জ্বল করছে।’’

‘‘বাজে কথা।’’ ক্ষিতীশ গম্ভীর স্বরে বলল, ‘‘মেডেল হয়তো আনে কিন্তু মুখোজ্জ্বল করার মতো কিছুই করেনি। শ্যামল চার বছর আগে এক মিনিট চার সেকেন্ডে হানড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল টানতো, এখনো তাই টানে। এটা কি মুখোজ্জ্বল করার মতো ব্যাপার?’’

হরিচরণ কথাগুলো না শোনার ভান করে বলতে লাগল, ''এইসব সুইমাররাই হচ্ছে ক্লাবের প্রাণ। এদের নিয়েই ক্লাব টিকে আছে, এগিয়ে চলেছে। এরা উজ্জ্বল, এরা চঞ্চল। এদের হ্যান্ডেল করতে হলে এদের মতো হয়ে এদের সঙ্গে মিশতে হবে, বুঝতে হবে, আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।''

''তার মানে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারবে, পড়াশুনা করবে না, ট্রেনিং করবে না — একে উচ্ছলতা বলে মানতে হবে! এদের সঙ্গে তাল রেখে আমাকে আধুনিক হতে হবে, তবেই এদের হ্যান্ডেল করা যাবে?''

''কিন্তু ওদের মন-মেজাজ বোঝার ক্ষমতা, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ক্ষিদ্দার নেই।''

হরিচরণ সকলের মুখের দিকে তাকাল। তিন-চারটি মাথা নড়ে উঠল একসঙ্গে সমর্থন জানিয়ে। ক্ষিতীশের চোখ পিটপিট করতে লাগল, পুরু লেন্সের ওধারে।

''ক্ষিদ্দা জুনিয়ার ছেলেদের সামনেই শ্যামলকে তার টাইম আর আমেরিকার ১২ বছরের মেয়েদের টাইমের তুলনা করে অপমান করেছেন; গোবিন্দ এখনো ব্রেস্ট স্ট্রোকে বেঙ্গল রেকর্ড হোল্ড করছে, লাস্ট ইয়ারেও বোমবাই ন্যাশনালে গেছল, তাকে বলেছেন কান ধরে ক্লাব থেকে বার করে দেবে। সুহাস ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে দিন দশেক আসতে পারেনি। তার বাড়িতে গিয়ে ক্ষিদ্দা সুহাসের বাবাকে যা তা কথা বলে এসেছেন। অমিয়া আর বেলা জুপিটার ছেড়ে অ্যাপোলোয় গেছে শুধুই ক্ষিদ্দার জন্য। উনি ওদের চুল কাটতে চেয়েছিলেন। পুরুষদের মতো ওদেরও বারবেল নিয়ে একসারসাইজ করার জন্য ঝগড়া করতেন। ওদের ড্রেস, ওদের সাজ নিয়ে রোজই খিটখিট করতেন। লাস্ট ইয়ারে আপনারা দেখেছেন, ওই দুটি মেয়ের জন্যই স্টেট মিটে অ্যাপোলো টিম চ্যাম্পিয়নশিপ পায়।''

হরিচরণ থামল। ক্ষিতীশের দিকে এতক্ষণ সে তাকায়নি। দেখল মুচকি মুচকি হাসছে। তাইতে সে অস্বস্তি বোধ করে ধীরেন ঘোষ, প্রফুল্ল বসাক এবং বদু চাটুজ্জের মুখের দিকে তাকাল।

নস্যির কৌটো বার করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে বদু চাটুজ্জে সিধে হয়ে বসল।

''প্রেসিডেন্ট স্যার, আমার একটা কথা বলার আছে। ট্রেনার যে হবে তার উপর ছেলেদের বা মেয়েদের শ্রদ্ধা থাকা চাই, আস্থা থাকা চাই। সে যেটা বলবে ওরা যেন নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজে সেটা করতে পারে। কিন্তু ক্ষিতীশ ওদের যা বলে সেটা ওরা বিশ্বাসভরে নিতে পারে কি?''

বদু চাটুজ্জে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য কথা থামিয়ে রুমাল বার করল। নাক মুছল গভীর মনোযোগে। রুমাল পকেটে রাখল।

''ক্ষিতীশ নিজে কখনো সাঁতার কাটেনি। কম্পিটিশনে কখনো নেমেছে বলে জানি না। ওর কথা ছেলেমেয়েরা কেন গ্রাহ্য করবে?''

''সে কী!'' প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড় অবাক হয়ে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। ''আপনি সাঁতার জানেন না?''

ক্ষিতীশ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ''সাঁতার জানি না বলতে বদু নিশ্চয় মিন করছে, আমি কখনো কোনো কম্পিটিশনে মেডেল পাইনি। তাই না?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাই-ই বলছি।'' ব্যস্ত হয়ে বদু বলল। ''কোচের রেপুটেশন থাকা দরকার। নয়তো ছেলেমেয়েরা মানবে কেন? হরিচরণকে ওরা মানে কেন? ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন ছিল, অলিম্পিকেও গেছে। গঙ্গায় ১৩ মাইলের কম্পিটিশন পর পর তিনবার জিতেছে।''

''আপনি ওলিম্পিকে গেছলেন!'' বিনোদ ভড়ের বিস্মিত ভ্রূ কপাল বেয়ে চুলে গিয়ে ঠেকল।

কিঞ্চিৎ গদ্‌গদ স্বরে হরিচরণ বলল, ''লন্ডনে ফরটি এইট ওলিম্পিকে আমি দেড় হাজার মিটারে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ওয়াটারপোলো টিমেও ছিলুম।''

''কী রেজাল্ট করেছিলেন?'' প্রেসিডেন্ট ঝুঁকে পড়ল টেবিলে।

হরিচরণ দ্রুত সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, ''পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডের জন্য ব্রোঞ্জটা মিস করেছি।''

হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করল ক্ষিতীশ। সবাই তার দিকে তাকাল।

কাশি থামিয়ে ক্ষিতীশ বলল, ''আই অ্যাম সরি। মাঝে মাঝে আমার এরকম হয়।''

প্রেসিডেন্ট বিরক্ত চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে আবার রাখল হরিচরণের মুখে।

''গোল্ড পেয়েছিল আমেরিকার ম্যাকলেন। জল থেকে উঠে আমায় বলেছিল, তুমি পাশে ছিলে তাই এত ভালো চার্জ পেয়েছি।''

''বটে বটে, তা আপনি কী বললেন?''

''আমি আর কী বলব, ওকে কনগ্র্যাচুলেট করে বললুম, ইন্ডিয়াতে যে টাইম করে এসেছি সেটা যদি আজ করতে পারতুম তাহলে ....''

হরিচরণ থেমে গেল।

খুক্ খুক্ একটা শব্দ হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বিরক্ত হয়ে বলল, ''আবার আপনি কাশছেন? নিশ্চয় আপনার কাশির অসুখ আছে।''

ক্ষিতীশ মুখ নীচু করে ফিসফিসিয়ে বলল, ''হরি, গোল্ড না সিলভার, তাহলে কোনটে হতো?''

হরিচরণ উত্তেজিত স্বরে বলল, ''মেডেলের কথা তো আমি বলিনি, তুমি হঠাৎ গায়ে পড়ে টিপ্পুনি কাটছ কেন?''

''জেলাসি।''

নস্যির কৌটোয় চাঁটা দিয়ে বদু মন্তব্য করল।

"ক্ষিতীশ বড়ো ফালতু কথা বলে।" কার্তিক সাহা এতক্ষণে মুখ খুলল। "বারবার দেখেছি কখনই ও হরিকে সহ্য করতে পারে না।"

"জেলাসিই হোক ফেলাসিই হোক, আমাকে পাঁচজনের সামনে বিদ্রূপ করে তুমি কী আনন্দ পাও ক্ষিদ্দা বলো তো?"

ক্ষিতীশ চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখল। কঠিন স্বরে বলল, "আমার বিরুদ্ধে আর কী অভিযোগ আছে ধীরেন?"

ধীরেন ঘোষ তাড়াতাড়ি ঝুঁকে কয়েকটা কাগজ উলটেপালটে বলল, "এই সবই আর কী। অভিযোগ এনেছে সুইমাররা। ওরা বাইরেই আছে। প্রেসিডেন্ট যদি বলেন তো ওরা নিজেরাই এখানে এসে বলতে পারে।"

"না, তার দরকার নেই।" ক্ষিতীশ চশমাটা চোখে পরল, "অভিযোগগুলি সত্যি।"

টেবলের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেউ মাথা নাড়ল, কেউ নড়েচড়ে বসল। ওদের ভাবভঙ্গিতে এই কথাটাই ফুটে উঠল — এইবার, তাহলে বাছাধন এইবার কী বলবে?

"আমি জানি ওরা কি বলবে। বলবে, আমি জলে নামি না, খাটতে বলি, না খাটলে গালাগালি করি। আপনারা বলবেন, আমি রেজাল্ট দেখাতে পারিনি তিন-চার বছর, আমার ব্যবহারে সুইমাররা বিদ্রোহ করেছে।"

"এমনকি মারবেও বলেছে।" যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য কথাটা বলেই, ধীরেন ও হরিচরণের ভ্রূকুটি দেখে থতমত হয়ে, "কী কাণ্ড, এখনো চা দিয়ে গেল না।" বলতে বলতে উঠে বেরিয়ে গেল।

"অভিযোগের জবাব নিশ্চয় আমাকে দিতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট গম্ভীর হয়ে বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছে। কিছু বলার থাকলে নিশ্চয় আমরা শুনব।"

সারা ঘর উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। চশমাটা আবার টেবলে রেখে ক্ষিতীশ চোখ বোঁজে।

"এই ক্লাবে আমি প্রথম আসি পঁয়ত্রিশ বছর আগে। ধীরেনও তখন আসে। বছর পাঁচেক পর হরিচরণ। ওদের মতো জুপিটারকে আমিও ভালোবাসি। আমিও চাই জুপিটারের গৌরব, চাই ভারতের সেরা হয়ে উঠুক জুপিটার। এই গৌরব এনে দেয় সাঁতারুরা, ওয়াটারপোলো প্লেয়াররা, ডাইভাররা। ওদের পারফরমেন্স যত উঠবে, গৌরবও তত বাড়বে। আমার যা কিছু চেষ্টা, তা ওদের উন্নতির জন্যই। এজন্য আমি কঠোর হয়েছি, গালিগালাজও দিয়েছি।"

ক্ষিতীশের বলার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে ঘরটা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল।

"সাঁতারে অবিশ্বাস্য রকমে পৃথিবী এগিয়ে গেছে। আর আমরা? আমাদের এক একটা রেকর্ডের বয়স দশ পনেরো বছর। পঁচিশ বছর হতে চলল শচীন নাগের রেকর্ডের বয়স! কেন এই থমকে থাকা? যেভাবে পৃথিবী এগোচ্ছে, আমাদেরও সেইভাবে এগোতে হবে।"

"এসব এমন কিছু কথা নয়; আমাদেরও জানা আছে। শুনতে ভালোই লাগে।" হরিচরণ ভারিক্কি চালে বলল এবং প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল। "আসল যে জিনিস ফুড সেটা কই? খাটবে যে খাদ্য কই? তা যখন পাওয়া যাবে না তখন খাটিয়ে খাটিয়ে টি বি রোগ ধরিয়ে দিয়ে লাভ কিছু হবে?"

"ঠিক কথা। ফুড কই?"

যজ্ঞেশ্বর টেবল চাপড়ে বলে উঠল।

প্রেসিডেন্ট এবং ধীরেন ঘোষ মাথা নাড়ল। বদু কৌটো থেকে বড়ো এক টিপ নস্যি বার করল।

"বাজে কথা।"

ক্ষিতীশ চাপা এবং দৃঢ়স্বরে বলল।

‘‘আজ পর্যন্ত কেউ টি বি রুগী হয়েছে সাঁতার কেটে, এমন কথা শুনিনি। আসলে এটা অলস ফাঁকিবাজদের, যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তাদের অজুহাত। যতটুকু খাদ্য আমরা জোটাতে পারি, সেই অনুপাতে আমরা ট্রেনিং করি না। শ্যামল, গোবিন্দ বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়, সাঁতারের জন্যই চাকরি পেয়েছে। কিন্তু সাঁতারকে তারা এর বিনিময়ে কী দিচ্ছে? এরা অকৃতজ্ঞ। এরা গুছিয়ে রোজ পাঁচ টাকাও যদি খাওয়ার জন্য খরচ করে, ডিসিপ্লিনড লাইফ লিড করে, নিয়মিত কঠিন ট্রেনিং করে, তাহলে দু-বছরেই এরা এক মিনিটে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল কাটবে, এক পাঁচে ব্যাক স্ট্রোক কাটবে।’’

‘‘তাহলে এদের ট্রেনিং করাতে পারেননি কেন?’’ ধীরেন বলল।

‘‘ছেলে ফেল করলে দোষটা মাস্টারমশায়েরও।’’ কার্তিক কনুই দিয়ে বদুকে খোঁচা দিল।

‘‘নিশ্চয়, শুধু ওদের অকৃতজ্ঞ বলে নিজের দোষ স্খালন করলে কি চলে!’’

‘‘না, আমি দোষ স্খালন করতে চাই না। বরং আমি বলতে চাই, এদের দিয়ে আর কিছু হবে না। এদের বয়েস হয়ে গেছে, এদের মনে পচ ধরেছে। এদের পিছনে পরিশ্রম করে লাভ নেই।’’

‘‘আমি বিশ্বাস করি না।’’ হরিচরণের তীব্র স্বরে ক্ষিতীশও বিস্মিত হলো।

‘‘কী বিশ্বাস করিস না?’’

‘‘এদের দিয়ে এখনো টাইম কমানো যায়। আমি করাতে পারি। আমি পারি এদের খাটাতে। পচ-টচ ধরেছে এসব বাজে কথা।’’

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ হরিচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

‘‘তাহলে তুই দায়িত্ব নে। আমি আজ থেকে চিফ ট্রেনারের পদ ছেড়ে দিলাম। রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেবো। আমি কাল থেকে আর আসব না।’’

‘‘না না, আসবে না এটা কী কথা!’’ বদু ব্যস্ত হয়ে উঠল। ‘‘এতদিনকার মেম্বার!’’

ক্ষিতীশ হাসল ম্লানভাবে, তারপরই চোখ দুটো পিট পিট করে উঠল। প্রেসিডেন্টকে লক্ষ করে বলল, ‘‘ট্রেনার হতে গেলে নামকরা সাঁতারু হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর নামকরা কোচেরা — ট্যালবট, কারলাইল, গ্যালাঘার, হেইন্স, কাউন্সিলম্যান এরা কেউ ওলিম্পিক চ্যামপিয়ন নয়। জলে নেমে এদের কোচ করতে হয় না। এরা সুইমারদের কোচ, নভিসদের নয়। জলের উপর থেকেই অনেক ভালো লক্ষ করা যায়, তাই ডাঙাতেই আমি থাকি।’’

‘‘ক্ষিদ্দা, তুমি দেখছি ওইসব কোচেদের সঙ্গে নিজেকে এক পঙ্ক্তিতে ফেললে।’’ যজ্ঞেশ্বর কৃত্রিম বিস্ময় চোখে ফোটাল।

‘‘ওরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তৈরি করছে, তুমি তো একটা বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নও তৈরি করতে পারনি!’’ কার্তিক সাহার গলায় বিদ্রূপ মোচড় দিল।

‘‘পারবে পারবে, নিশ্চয় পারবে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আমরা শিগ্গিরই পাব, তাই না ক্ষিতীশ?’’ ধীরেন ঘোষ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

‘‘চ্যাম্পিয়ন সুইমার তৈরি করা এদেশে সম্ভব নয়।’’ প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড় এতক্ষণে কথা বলল।

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

‘‘কোনো দেশেই সম্ভব নয়। চ্যাম্পিয়নরা জন্মায়, ওদের তৈরি করা যায় না। ওদের খোঁজে থাকতে হয়, লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নিতে হয়।’’ ক্লান্তস্বরে কথাগুলো বলে ক্ষিতীশ দরজার দিকে এগোল।

‘‘সেই ভালো, এবার থেকে তপস্যা শুরু করো ক্ষিদ্দা।’’

‘‘ক্ষিতীশ, চা-টা খেয়ে যাও।’’

‘‘ক্ষিতীশবাবু, ক্লাবে আপনার কিন্তু রেগুলার আসা চাই।’’

ঘর থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ দেখল শ্যামল, গোবিন্দ এবং আরো চার পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল সে। ওরা হঠাৎ কাঠের মতো হয়ে গেল।

"তোদের অনেক বকেছি-ঝকেছি, কটু কথাও বলেছি। আর এসব শুনতে হবে না। আজ থেকে আমি আর এ ক্লাবের ট্রেনার নই। সাঁতারটা মন দিয়ে করিস।"

ক্ষিতীশ মাথা নামিয়ে ধীর পায়ে ক্লাবের বাইরে এসে দাঁড়াল।

কমলদিঘির কালো জলের উপর পার্কের আলোগুলো খড়ির মতো দাগ টেনেছে। জুপিটার ক্লাববাড়ির চুড়োর ঘড়িতে আটটা বাজতে পাঁচ। দিঘিটা আকারে গোল। তাকে ঘিরে ইট বাঁধানো রাস্তা। নারী পুরুষ শিশুর ভিড়ে রাস্তাটা গিজগিজ করছে। আলোগুলোর নীচে তাস খেলা চলছে, অক্‌সন ব্রিজ বা টোয়েন্টিনাইন। মাঝে মাঝে দমকা চিৎকার উঠছে তাসের আড্ডা থেকে। বেঞ্চগুলোয় বসার স্থান নেই। ফুলগাছের ঝোপগুলো লোহার বেড়ায় ঘেরা। বেড়ায় ঠেস দিয়ে যুবকরা গল্প করছে। ঘুগনি, আলুকাবলি, বাদাম, ঝালমুড়ি বা কুলফি মালাইওয়ালারা ব্যবসায়ে ব্যস্ত।

দুটি হাত রেলিংয়ে রেখে ক্ষিতীশ দিঘির অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে। জুপিটারের ঠিক উলটোদিকেই অ্যাপোলোর ক্লাববাড়ি। ডাইভিং বোর্ডের কংক্রিট কাঠামোর থামগুলো অন্ধকারে ব্রহ্মদত্যির পায়ের মতো জল থেকে উঠেছে।

"ক্ষিদ্দা!"

চমকে পিছনে তাকাল ক্ষিতীশ।

"ভেলো!"

"কী হলো ক্ষিদ্দা?"

"কী আবার হবে, ছেড়ে দিলুম।"

"ভালোই করেছ। ঝগড়াঝাটি, গোলমাল হয়নি তো?"

"না।"

ক্ষিতীশ মুখটা আবার জলের দিকে ঘোরাল। হাওয়া বয়ে আসছে জলের উপর দিয়ে। বাতাসে জলের কণা, আর শ্যাওলা আর ঝাঁঝির আঁশটে গন্ধ। পঁয়ত্রিশ বছর এই শুঁকে আসছে ক্ষিতীশ। তার কাছে এর থেকে সুবাস পৃথিবীতে নেই।

ভেলো পাশে এসে দাঁড়াল।

"ভেলো, কী করি এখন বলতো রে। একেবারেই বেকার হয়ে গেলুম।"

"এবার প্রজাপতিকে বরং দেখাশুনা করো। বউদি একা মেয়েমানুষ, অন্যরাও মেয়ে, পুরুষমানুষ একজন থাকা দরকার। কখন কী মুশকিলে ওরা পড়ে যাবে তার ঠিক কী!"

"তোর বউদি মানুষটি ছোট্টখাট্ট, কিন্তু আমার থেকে দশগুণ লম্বা কাজের বেলায়। প্রজাপতিতে দারোয়ানি ছাড়া আমায় দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না।"

"তাহলে?"

ক্ষিতীশ আবার জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ক্ষিদ্দা, যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।"

ক্ষিতীশ মুখ ফেরাল।

"তুমি অ্যাপোলোয় চলো।"

"না, ওরা জুপিটারের শত্রু। কতকগুলো স্বার্থপর লোভী মূর্খ আমায় দল পাকিয়ে তাড়িয়েছে বলে শত্রুর ঘরে গিয়ে উঠব?"

"কিন্তু ওখানে তুমি জল পাবে, শেখাবার ছেলেমেয়ে পাবে, কাজ চাইছ কাজ পাবে। অপমানের শোধ তোমায় নিতে হবে। শত্রু-মিত্র বাছবিচার করে কী লাভ?"

ক্ষিতীশ বিব্রতমুখে চুপ করে রইল। তার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে সেটা তাকে এই মুহূর্তে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে দিচ্ছে না। জুপিটারের সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক, কিন্তু সাঁতারু তৈরি করা তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ব্রত। লক্ষ্যপূরণ করতে হলে নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতেই হবে। কিন্তু তা কি সে পারবে? ক্ষিতীশ মাথাটা ঝাঁকাল।

''তাহলে হেদো কিংবা গোলদিঘির কোনো ক্লাবে চলো।''

''কোথাও গিয়ে আমি টিকতে পারব না রে।'' ক্ষিতীশ হাঁটতে শুরু করল একটু জোরেই।

''চুপচাপ বসে থাকবে?'' ভেলো হ্যাঁচকা দিয়ে প্যান্ট টেনে তুলে ক্ষিতীশের পাশাপাশি থাকার জন্য প্রায় ছুটতে শুরু করল।

''আমি এবার সত্যিকারের কাজ করতে চাই। সবাইকে দেখিয়ে দেবো একবার। চ্যাম্পিয়ন তৈরি করব আমি। গড়ব আমি মনের মতো করে। একবার, শুধু একবার যদি তেমন কারুর দেখা পাই।''

মাথা নীচু করে ক্ষিতীশ হনহনিয়ে কমলদিঘির গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল। ভেলো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গেটের পাশে দাঁড়ানো আলুকাবলিওলাকে বলল, ''জাস্তি ঝাল দিয়ে চার আনার বানাও।''

সকাল আটটা প্রায়।

ক্ষিতীশ বাজার করে ফিরছে। জুপিটারে আর সে যায় না। সকাল-বিকাল এখন তার কোনো কাজ নেই। অবশ্য বাজার করাটা তার নিত্যদিনের কাজগুলির অন্যতম। সে বাজারে যায় বাড়ির কাছের বস্তির সরু গলি দিয়ে, ফেরে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চিলড্রেনস পার্কটাকে ঘুরে অন্য পথ ধরে।

আজ ফেরার পথে দেখল পার্কে খুব ভিড়। বিশ্রাম চালাটায় টেবিল চেয়ার পাতা। লাউডস্পিকারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে। হঠাৎ বন্ধ করে ঘোষণা হলো — ''নেতাজি বালক সঙ্ঘের উদ্যোগে কুড়ি ঘণ্টা অবিরাম ভ্রমণ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কাল রাত আটটায়। শেষ হবে আজ বিকেল চারিটায়।''

লাউডস্পিকারে অন্য একটা চাপা গলা শোনা গেল : ''এই শালা, চারিটায় কি রে, বল্ চার ঘটিকায়। অ্যালাউনস করতে হলে শুদ্ধু করে বলতে হয়।''

''যা লেখা আছে তাই তো পড়ছি।''

''দে দে, আমাকে মাইক দে।''

এরপর অন্য এক কণ্ঠে শোনা গেল: ''পতিযোগিতা শুরু হইয়াছে কল্য রাত্রি আট ঘটিকায়, উদ্ধোধন করেন অতীতদিনের খ্যাতকীর্তি ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মাইতি। প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হইবে অদ্য বৈকাল চারি ঘটিকায়। পুরস্কার বিতরণ করিবেন সন্ধেয় জননেতা ও আমাদের সঙ্ঘের প্রধান পিষ্টপোষক শ্রীবিষ্টুচরণ ধর মহাশয়। পতিযোগিতায় নেমেছিল বাইশজন পতিযোগী, আটজন অবসর নিয়েছে ইতিমধ্যে।''

ক্ষিতীশের চোখ হঠাৎ আটকে গেছে কঞ্চির মতো লম্বা, নিকষকালো একটি চেহারাতে।

গোলাকৃতি পার্কটিকে ঘিরে রেলিং। তার থেকে ছয় হাত ভিতরে সিমেন্টের পথটা বেড় দিয়েছে মধ্যস্থলের ঘাসের জমিকে। প্রতিযোগীরা পথ ধরে হাঁটছে ক্লান্ত, মন্থরগতিতে। অধিকাংশেরই বয়স ১৬-১৭। বৈশাখের ভয়ংকর রোদ মাথায় নিয়ে, তপ্ত সিমেন্টের ওপর ওদের সারা দুপুর হাঁটতে হবে।

পরনে ঢিলে ফুল প্যান্ট, ঢলঢলে বুশ শার্ট, পায়ে হাওয়াই চটি। চুলটা ছেলেদের মতো হলেও, ঘাড়ের কিনারে পৌঁছে গেছে। রাস্তার মাঝ থেকে ক্ষিতীশ রেলিংয়ের ধারে সরে এল।

ক্ষিতীশের চোখ অনুসরণ করতে লাগল শুধু একজনকেই। পার্কের মধ্যে শিশু ও বালকদেরই ভিড়। বয়স্করা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে শুধুমাত্র ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিযোগীদের চোখে রাত্রি জাগরণ, ক্লান্তি আর ক্ষুধার ছাপ। পার্কের চক্কর প্রায় ৭৫ মিটারের। ওদের কেউ কেউ চেনা লোকেদের দেখে শুকনো হাসছে, দু-চারটে কথা বলছে। গঙ্গায় সাঁতারের সঙ্গী সেই তিনটি ছেলে পার্কের মধ্যে ঘাসের উপর দিয়ে কোনির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওর সঙ্গে কথা বলল। কোনি হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলছে। চটিজোড়া খুলে পথের পাশে রাখল। উদ্যোক্তাদের দেওয়া লজেঞ্জস্ পকেট থেকে বার করে ওদের তিনজনকে দিয়ে, একটা মুখে পুরল। হাঁটতে হাঁটতে সে মুখের কাছে হাত তুলে জলপানের ইশারা করতেই নেতাজি বালক সঙ্ঘের একজন ছুটে গিয়ে তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে এল। তিন-চার চক্করের পর আবার সে চটি পরল।

ক্ষিতীশের হুঁশ ফিরল যখন তার প্রতিবেশী অমূল্যবাবু অফিস যাবার পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, ‘‘কী দেখছেন ক্ষিতীশবাবু, বাঙালিদের ক্রীড়াচর্চা?’’

লোকটিকে ক্ষিতীশ একদমই পছন্দ করে না, শুধুই নাটকীয় ঢঙে বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

‘‘কী আর করবে বলুন, আমরা ওদের ক্রীড়াচর্চার জন্যে কিছু ব্যবস্থা তো করে দিইনি। ওরা ওদের মতোই যা হোক ব্যবস্থা করে নিয়েছে।’’

কথায় কথা বাড়ে। তাই ক্ষিতীশ আর না দাঁড়িয়ে বাড়িমুখো হলো।

সদর দরজা তালাবন্ধ। লীলাবতী বেরিয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় চাবি ক্ষিতীশের কাছে আছে। ঘড়ি দেখে সে জিভ কাটল। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি হয়েছে, অর্থাৎ লীলাবতী এতই রেগেছে যে রান্না না চাপিয়েই বেরিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ রান্নার উদ্যোগ শুরু করল। আনাজ কুটতে বসে বারবার তার ইচ্ছে করল পার্কে গিয়ে কোনিকে দেখতে। এই দ্বিতীয়বার সে ওকে দেখলে।

অবিরাম হাঁটা ব্যাপারটা সে একদমই পছন্দ করে না। এতে বুদ্ধির দরকার হয় না আর বলদের মতো শুধু পাক খাওয়া। স্পিড দরকার হয় না, পেশির জোর লাগে না, পাল্লা দিতে হয় না আর একটা মানুষের সঙ্গে। একে স্পোর্ট বলতে ক্ষিতীশের ভীষণ আপত্তি।

একবার সে গোলদিঘিতে চিৎকার করে তার আপত্তিটা জানিয়েছিল ৯০ ঘণ্টা সাঁতার কেটে বিশ্বরেকর্ড লাভে প্রয়াসী এক সাঁতারুকে। ‘‘ওরে বুদ্ধু, এখনো যে একটা ওলিম্পিক মেডেল সাঁতার কেটে আমরা পাইনি আর এসব বুজরুকি দেখিয়ে রেকর্ড করে কি তুই দেশের মান বাড়াবি?’’

ক্ষিতীশকে জনাচারেক চেনা লোক টেনে সরিয়ে না দিলে হয়তো সে তখুনি জলে ঝাঁপিয়ে সম্ভাব্য বিশ্ব রেকর্ডটিকে তছনছ করে দিত। তবে সে এইটুকু মাত্র মানে, এইসব অবিরাম ব্যাপারগুলোর মধ্য দিয়ে কার কেমন সহ্যশীলতা কেমন একগুঁয়েমি সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কী লাভ তাতে হয় যদি না সুশৃঙ্খল ট্রেনিং আর টেকনিকের মারফত সেগুলো বড়ো কাজে লাগানো হয়!

অপচয়। ক্ষিতীশ এইসব অপচয় দেখে বিরক্ত বোধ করে। খুব বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু এখন সে ছটফট করছে পার্কে যাবার জন্য। উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখল। হিসেব কষে বার করল, কোনি প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা হাঁটছে। এখনো ছ-ঘণ্টা বাকি। ভয়ংকর এই শেষের ছ-ঘণ্টা। টিকতে পারবে কি!

কুকারে রান্না চাপিয়ে ক্ষিতীশ দরজায় তালা এঁটে আবার বেরিয়ে পড়ল।

পার্কে দর্শকদের সংখ্যা ক্ষীণ। গাছের ছায়ায় কিছু আর বিশ্রাম-চালায় উদ্যোক্তারা। কোনি হাঁটছে, মাথায় ছেঁড়া বেতের টুপি। ক্ষিতীশ গুনে দেখল ওরা তেরোজন। একজন বসে গেছে। পার্কে ঢুকে সে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াল। কোনি যখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কোনির গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চিবুকে চোখ দুটি বসে গেছে, গালের উঁচু হাড় দুটো আরো উঁচু, ঠোঁটের চামড়া শুকনো। কিন্তু মাথাটা তুলে যেভাবে পাতলা দেহটাকে সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাইতে ক্ষিতীশের মনে হলো, আকাশ থেকে আগুন ঝরলেও কোনির চলা থামবে না।

কেন মনে হলো, ক্ষিতীশ তা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। শুধু এইটুকুই সে বলবে, একটা লোক নিজের সম্পর্কে কী ভাবে, সেটা বোঝা যায় চলার সময় মাথাটা সে কেমনভাবে রাখে তাই দেখে।

ক্ষিতীশ বাড়ি ফিরল বারোটায়। লীলাবতী কথা বলছিল দোকানের দুটি মেয়ের সঙ্গে। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, ‘‘হাতিবাগানের ঘর কী হলো?’’

‘‘অনেক টাকা সেলামি চায়। সম্ভব নয়।’’

সে ঘরে ঢুকে গেল। অন্যমনস্কের মতো স্নান ও খাওয়া সেরে সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল। তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়ল।

তেরো থেকে আট, বসে গেছে পাঁচজন। পার্কে এখন বেশ ভিড়। লাউডস্পিকার রেকর্ড বাজানো বন্ধ করে নানাবিধ ঘোষণায় মত্ত। তারই মাঝে প্রতিযোগীদের জানিয়ে দেওয়া হলো, আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট বাকি।

কোনি হাঁটছে। ক্ষিতীশ জানতো ও হাঁটবে এবং শেষ করবে। ক্লান্তি ওর পদক্ষেপে ধরা পড়ছে। সকালের সেই তিনটি ছেলে ওর পাশাপাশি ঘাসের উপর দিয়ে চলছে। কোনি দু’একবার ওদের কথা শুনে হাসল। ক্ষিতীশ লক্ষ করল ডান পা-টা টেনে টেনে হাঁটছে। অন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে দুটি বছর দশেকের ছেলে, বেশ তাজাই দেখাচ্ছে।

‘‘আমাদের আজকের সভাপতি বরেণ্য জননেতা ও এই সঙ্ঘের হিতৈষী শ্রীযুৎ বিষ্টুচরণ ধর মহাশয় তার শত কাজ ফেলে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। এজন্য আমরা গর্বিত।’’

ক্ষিতীশ লাউডস্পিকার থেকে কান সরিয়ে চোখ পাঠাল চালার নীচে। সেখানে টেবিলের উপরে ইতিমধ্যে একটি সাদা চাদরের ও তোড়াভরা দুটি ফুলদানির আবির্ভাব ঘটেছে। তার পিছনে বসে আজকের সভাপতি।

আরে, এ তো গঙ্গার ঘাটে দেখা সেই হিপোটা! ক্ষিতীশ অবাক হয়ে গেল।

‘‘আর কুড়ি মিনিট বাকি প্রতিযোগিতা শেষ হতে। তারপরই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।’’

লাউডস্পিকারে ফিসফাস আলোচনা শোনা গেল। ‘‘বলতে ভুল হয়ে গেছে, পুরস্কার বিতরণের আগে সভাপতি মহাশয় তার ভাষণ দেবেন।’’

আটজনেই শেষ করল প্রতিযোগিতা। পার্কে হাজির প্রায় একশো শিশু, বালক ও বয়স্ক ভিড় করে দাঁড়াল চালার সামনে। ক্ষিতীশও এগিয়ে গেল।

তার চোখ খুঁজতে খুঁজতে কোনিকে পেল। সিমেন্টের সিঁড়ির ধাপে বসে পা ছড়িয়ে দু-হাতে টিপছে ডান ঊরু।

‘‘ওরে বাব্বা, আর আমি হাঁটার রেসে নামছি না। দুর্‌ দুর্‌ ফাস সেকেন থাড নেই।’’

‘‘তোকে তো পই পই বলেছিলুম, নাম দিস না। আমি আর ভাদু একবার নেমেই টের পেয়ে গেছলুম, বোগাস ব্যাপার।’’

‘‘কান্তি যে বলেছিল, লোকেরা এসে পিন দিয়ে টাকা আটকে দেয় জামায়, কই দিল না তো!’’

‘‘এসব ছোটোখাটো কম্পিটিশনে দেয় না।’’

"তোকে বলেছে! কোনি যদি ফ্রক পরে নামতো দেখতিস, অন্তত বিশ-পঁচিশ পেয়ে যেত। প্যান্ট শার্ট পরলে তো ওকে ছেলে দেখায়।"

"ঘোড়ার ডিম দিত, এখানকার লোকেরাই কঞ্জুস।"

"না রে, ঠিকই বলেছে ভাদুটা, আমাকে প্যান্ট পরলে ছেলেদের মতোই তো দেখায়। এই দ্যাখ তো চুন্ডু, প্রাইজ-ফ্রাইজ কী দেবে, পুরো একদিন বাড়ির বাইরে, মা মেরে ফেলবে যদি কিছু হাতে করে না নিয়ে যাই।"

লাউডস্পিকারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাগুলি শেষ হয়েছে। সভাপতি বিষ্টু ধর বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে।

ক্ষিতীশ হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে কোনিদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি সাঁতার শিখবে?"

মুখটা তুলল সে। কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুলে ভরা মাথা আর পুরু লেনসের পিছনে জ্বলজ্বলে দুটি চোখের দিকে একটু বিরক্তভরেই তাকাল। তারপর আবার সে নিজের পা টিপতে লাগল।

"শিখবে সাঁতার?"

"সাঁতার আমি জানি।"

"না, জানো না।"

ঝটকা দিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে কোনি আবার মুখ তুলল।

"আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ জানি। আমি দেখেছি তোমায় গঙ্গায়। ও সাঁতার চলবে না। সাঁতার শেখার জিনিস।"

‘‘যা জানি তাতেই গঙ্গা এপার-ওপার করতে পারি, শেখার আবার আছে কী?’’

‘‘অনেক কিছু শেখার আছে।’’

‘‘আমার দরকার নেই শিখে, যা জানি তাই যথেষ্ট।’’

ক্ষিতীশের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কোনি দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল, ‘অ্যাই গোপলা শুনে যা।’’

টেবিলে স্তূপীকৃত নানাবিধ প্রাইজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা খালি পা, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে বছর বারোর একটি ছেলে এগিয়ে এল।

‘‘হ্যাঁ রে, মা কিছু বলেছে?’’

‘‘যাও না বাড়িতে, পিটিয়ে তোমার চামড়া তুলে নেবে।’’

‘‘দাদা?’’

‘‘দাদা আজ কাজে যায়নি, জ্বর হয়েছে। মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তোমাকে নিয়ে। দাদা বলেছে, বেশ করেছে কোনি।’’

ক্ষিতীশ ভাবল, আর একবার কোনির সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু ততক্ষণে কোনিকে ডেকে নিয়ে গেছে নেতাজি বালক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা। প্রতিযোগীদের হাতে একটি করে খাবারের ঠোঙা দেওয়া হচ্ছে।

‘‘এই যে শরীর, একে চাকর বানাতে হবে।’’

ক্ষিতীশ ফিরে তাকাল বক্তৃতাকারীর দিকে। মাইক্রোফোনের পিছনে একটি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চর্বির ঢিপি। ক্ষিতীশ ভিড় কেটে চাতালের দিকে এগোল।

‘‘কী করে তা সম্ভব? আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা আছে কিন্তু পারেন কি আপনি আর্চ করতে, পিকক্ হতে? যদি কেউ আপনাকে চাঁটি মেরে পালায়, পারবেন কি তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরতে? না, পারবেন না, আমি জানি আপনি পারবেন না।’’

সভাপতির পিছন থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘‘একবার পরীক্ষা করে দেখব নাকি?’’

বিষ্টু ধর পিছন দিকে তাকাল। ক্ষিতীশকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। মাইকে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘‘সব জায়গায় ইয়ারকি করবেন না।’’ তারপর হাত সরিয়ে বলতে শুরু করল, ‘‘কেন পারবেন না, জানেন কি কারণটা?’’ কারণ, আপনার শরীর ফিট নয়। আর ফিটনেস আসে নিয়মিত ব্যায়াম থেকে।’’

বিষ্টু ধর পিছন ফিরে তাকাল। ক্ষিতীশ মাথা হেলিয়ে তারিফ জানাল।

‘‘ব্যায়াম সেইজন্যই সকলের করা দরকার। হাঁটাও একটা ব্যায়াম। তাই নেতাজি বালক সঙ্ঘের তরুণ কর্মীদের, যারা দিনরাত পরিশ্রম করে আজকের এই প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলেছে, তাদের বললাম তোমরা হাঁটার ব্যবস্থা করো, আমি আছি তোমাদের সাথে। এটা সমাজসেবার কাজ, আমি থাকব তোমাদের পাশে পাশে।’’

‘‘উঁহু, আগে আগে। নেতৃত্ব দিতে হলে সামনে থাকতে হয়।’’

বিষ্টু ধর পিছনে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর মাথা হেলাল, ‘‘পাশে পাশেই বা বলি কেন, আমি থাকব আগে আগে। সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষকে সুস্থ সবল করার জন্য যখনই সংগঠন গড়ে উঠবে, সবার আগে আমাকে ছুটে আসতেই হবে।’’

‘‘ছোটার কথা চেপে যান।’’ পিছন থেকে ফিসফাস শোনা গেল, ‘‘যদি কেউ বলে একটু ছুটে দেখান!’’

বিষ্টু ধর ঢোক গিলে বলল, ‘‘কিন্তু ছুটেই বা আসব কেন! মানুষ ছোটে কখন? যখন সে ভয় পায়, দিশাহার হয়। কিন্তু জনগণ সহায় থাকলে আমি ভয় পাব কেন? জনগণই পথ বলে দেবে, সুতরাং দিশাহারা হব কেন? না, আপানাদের আশীর্বাদ থাকলে আমি ভয় পাব না। সঠিক পথেই আপনাদের সেবা, দেশের ও দশের সেবা করে যেতে পারব। তাই আজ প্রতিযোগীদের এই কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব, শরীরটাকে ফিট না করলে পরিশ্রম করতে পারবে না। পরিশ্রম না করলে দেশ গড়ে তুলতে পারবে না। তাই আজ যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তোমরা হাঁটা শুরু করলে .....’’

বিষ্টু ধর পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে লাগল। ‘‘এই যে হাঁটা, এ হাঁটা জীবনের পথে.....’’

বিষ্টু ধর অসহায়ভাবে পিছনে তাকাল।

‘‘ভুলে গেছেন?’’

ঘাড় নেড়ে অসহায়ভাবে বিষ্টু ধর ফিসফিস করে বলল, ‘‘রবি ঠাকুরের একটা পদ্য লিখে এনেছিলুম, পাচ্ছি না।’’

‘‘বলুন এই যে যাত্রা শুরু হলো ছোট্ট এই পার্কে —’’

মাইক্রোফোনে গম্‌গম্ করে উঠল সভাপতির আবেগভরা কণ্ঠ, ‘‘এই যে যাত্রা শুরু হলো, ছোট্ট পার্কে —’’

‘‘ধীরে ধীরে তা বৃহত্তর জীবনের দিকে, সুখ-সমৃদ্ধিভরা জীবনের দিকে তোমাদের নিয়ে যাক। এই পার্ক পরিক্রমা রূপান্তরিত হোক বিশ্ব পরিক্রমায়, জয় হিন্দ।’’

বিষ্টু ধর হুবহু বলে গেল ক্ষিতীশের প্রম্পট্ শুনে। শুধু জয় হিন্দের পর গলা কাঁপিয়ে যোগ করল, ‘‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ।’’

পুরস্কার দেওয়া হলো; প্লাস্টিকের কিট ব্যাগ আর তোয়ালে পেল যারা ২০ ঘণ্টা সম্পূর্ণ করেছে। ১৬ ঘন্টার পরে যারা অবসর নিয়েছে তাদের শুধুই ব্যাগ আর ১২ ঘণ্টার পরে যারা তাদের তাদের শুধুই তোয়ালে। কোনি পুরস্কার নিয়ে ব্যাগটা উলটেপালটে দেখল। সভাপতিকে নমস্কার জানানোর দরকারও মনে করল না। খাবারের ঠোঙাটা ব্যাগের মধ্যে ভরে সে ভাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, ‘‘চ বাড়ি যাই, এটা মাকে দিতে হবে।’’

ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনি চলে যাচ্ছে।

ক্ষিতীশ একদৃষ্টে তাকিয়ে। মাথাটা উঁচু, কঞ্চির মতো শরীরটা দুলছে। সঙ্গে ওর বন্ধু ভাদু আর চণ্ডু। পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্ষিতীশের মনে হলো, ওর বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে হতো।

‘‘আপনাকে বেষ্টাদা ডাকছে।’’

‘‘কে বেষ্টাদা?’’ অন্যমনস্ক ক্ষিতীশ বলল।

‘‘আজ যিনি সভাপতি।’’

ক্ষিতীশকে দেখেই বিষ্টু ধর একগাল হেসে বলল, ‘‘ফিনিশিংটা, সবাই বলছে দারুণ হয়েছে।’’ তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ‘‘ইনকিলাব জিন্দাবাদটা অ্যাড্ করলুম, তার কারণ আছে। আমার প্রগ্রেসিভ নেচারটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। চলুন চলুন, আমার গাড়ি রয়েছে, আপনাকে সব বলছি, আমার বাড়ি চলুন।’’

বিষ্টু ধর আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবে। তাই এখন থেকেই সে তোড়জোড় শুরু করেছে। পাড়ায় পাড়ায় নানান ব্যাপারে টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করাচ্ছে আর তাতে সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। নির্দলীয় সমাজসেবক হিসাবে সে ভোট চাইবে।

বিষ্টু ধর গাড়িতে বসে কথাগুলো জানিয়ে দিল।

বাড়ি পৌঁছে বলল, ‘‘আপনাকে আমার দরকার।’’

‘‘আমাকে!’’

‘‘হ্যাঁ, আপনি আমার ইস্পিচ-রাইটার হবেন, বক্তৃতা লিখে দেবেন। অবশ্য এজন্য টাকা দেবো। রাজি?’’

‘‘আমি তো খেলার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু জানি না!’’ ক্ষিতীশ বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে বলল।

‘‘সেইজন্যেই তো আপনাকে চাই। খেলা নিয়েই বক্তৃতা দিতে চাই, আর কিছু নিয়ে নয়। বিনোদ ভড় হচ্ছে সিটিং এম এল এ। খেলার লাইনের লোক। অনেক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমিও খেলার লাইন ধরে ক্যাম্পেন করব। বিনোদ ভড় মিনিস্টার হতে চায়।’’

সিঙারা মুখে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, ‘‘ভেবে দেখি।’’

রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা।

পঁচিশজন প্রতিযোগী। বাইশটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে।

স্টারটিং পয়েন্টে ভিড়। প্রতিযোগীরা তেল মাখায় ব্যস্ত। উদ্যোক্তা ঢাকুরিয়া স্পোর্টস ক্লাবের অনুরোধে ক্ষিতীশ প্রতিযোগিতার রেফারি অফ দ্য কোর্স। সাঁতারুদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে নৌকোয়।

স্টারটিং পয়েন্ট থেকে একটু এগিয়ে সে আর ভেলো নৌকোয় বসে।

"ক্ষিদ্দা, কে জিতবে বলো তো? সুবীরই মনে হচ্ছে।"

"সুবীরের নামা অন্যায় হয়েছে। এসব কম্পিটিশনে নামীদের থাকা উচিত নয়। ও তো ন্যাশনাল জুনিয়ার রেকর্ড হোল্ড করছে।"

"যা বলেছ। তবে বেশির ভাগই আনকোরা দেখছি।"

ভেলো সারি দিয়ে দাঁড়ানো সাঁতারুদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, "ওই লাল কস্ট্যুমপরা মেয়েটা কে বলো তো? কখনো তো দেখিনি!"

এত দূর থেকে ক্ষিতীশ, পুরু লেনসের মধ্য দিয়ে, সাদা টুপি মাথায়, লাল রঙে মোড়া তুষারধবল একটি দেহমাত্র দেখতে পেল।

"কে, তা আমি জানব কী করে!"

"না, এমনিই বলছি। বালিগঞ্জ ক্লাবের ট্রেনার প্রণবেন্দু বিশ্বাসকে দেখলুম কিনা মেয়েটার সঙ্গে। খুব বড়লোক মনে হলো। ওই যে সবুজ মোটরটা, ওটায় করে এসে নামল। সঙ্গে বাবা-মাও যেন রয়েছে।"

"তুই বড্ড বেশি দেখিস।"

"না দেখে উপায় আছে, মোমের পুতুলের মতো চেহারা! ওর পাশেই দ্যাখো, পোড়ামাটির কেলে পিলসুজের মতো একটা। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে দ্যাখো।"

ক্ষিতীশ দেখার চেষ্টা করল। সেকেন্ড কয়েক তাকিয়ে থেকে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা শব্দ, "কোনি!"

ঠিক তখনই স্টার্টারের বন্দুক গর্জে উঠল।

সাঁতারুরা এগিয়ে যাবার পর ক্ষিতীশদের নৌকোটা পিছু নিল।

সুবীর এবং আরো গুটি দশেক ছেলে একঝাঁকে এগিয়ে গেছে। তারপরেও আর এক ঝাঁক। সব শেষে তিনটি মেয়ে ও দুটি বাচ্চা ছেলে।

পাঁচশো মিটার পর্যন্ত এরা পাঁচজন প্রায় একসঙ্গেই ছিল। তারপরই লাল কস্ট্যুম ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

"ক্ষিদ্দা, স্ট্রোক দেখেছ! শরীরটাকে কেমন ভাসিয়ে রেখেছে!"

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ লক্ষ করে বলল, "মাথাটা ঠিকমতো নাড়ানো হচ্ছে না। সেন্ট্রাল পোজিশনে না থাকলে শরীরের ব্যালান্স নষ্ট হয়, স্পিডও কমিয়ে দেয়; শরীরটা রোল করছে বড্ড বেশি। কনুই আরো উঠবে..."

“অ্যাই অ্যাই, অমনি তোমার শুরু হয়ে গেল খুঁত ধরা।”

“খুঁত না ধরলে দোষ সারবে কী করে!”

“ও কি তোমার ছাত্তর?”

“নাইবা হলো।”

সামনের দু-ঝাঁকের সাঁতারুদের কেউ কেউ এবার মন্থর হয়ে পিছিয়ে পড়ছে। ক্ষিতীশ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। বাচ্চা ছেলে দুটির সঙ্গে কোনি আসছে বৈঠার মতো হাত চালিয়ে, দু-ধারে মাথা নাড়াতে নাড়াতে। ওদের থেকে অন্তত কুড়ি মিটার সামনে আর একটি মেয়ে, সমান তালে একই গতিতে সাঁতরে চলেছে। লাল কস্ট্যুমের মেয়েটি তার থেকে আরো তিরিশ মিটার সামনে এবং একটি ছেলের থেকে হাত দশেক পিছনে।

“কো ও ও নি ই ই।”

সরোবরের পূর্ব তীর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

ক্ষিতীশ আর ভেলো একসঙ্গেই তাকাল, বছর পঁচিশের, শ্যামবর্ণ একটি রুগ্ন যুবক পাড় ঘেঁষে ছুটছে। পরনে ধুতি ও নীল শার্ট। চটি জোড়া হাতে।

“কো ও ও নি ই ই... কো ও ও নি ই ই।”

গলার স্বরটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। পাড়ে ভিড় জমেছে। সাঁতার দেখতে। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে ছুটছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাচ্ছে। মুখখানি অসহায়।

“কো ও ও নি ই।”

চিৎকারটা হতাশায় ভেঙে পড়ল। ক্ষিতীশ দেখল কোনিকে পিছনে ফেলে বাচ্চা দুটি এগোচ্ছে। লাল কস্ট্যুম দুটি ছেলেকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

“কে বলো তো ক্ষিদ্দা?”

“জানি না, কোনো কম্পিটিটারের বাড়ির লোক হবে হয়তো।”

পাড়ের রাস্তা ধরে ধীর গতিতে সবুজ রঙের একটা ফিয়াট চলেছে। গাড়ির জানালায় উৎকণ্ঠিত একটি পুরুষ ও একটি মহিলার মুখ। মাঝে মাঝে হর্ন দিচ্ছে।

“কো ও ও ন্ ই ই।”

নৌকোটা ছপছপ শব্দে দাঁড় ফেলে এগোচ্ছে। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নীলশার্ট পরা যুবকটি দাঁড়িয়ে। ক্রমশ সে ক্ষিতীশের চোখে ছোটো হয়ে ঝাপসা হতে শুরু করল। জলের উপর, অনেক পিছনে দুটি হাতের ওঠানামা হচ্ছে। তারপর আর দেখা গেল না হাত দুটো। পড়ন্ত রোদে মাঝে মাঝে চিক্ চিক করে উঠছে ছিটকে ওঠা জল।

সামনে হই চই শোনা গেল। প্রথম প্রতিযোগী সাঁতার শেষ করেছে। সম্ভবত সুবীরই।

কোনি জল থেকে উঠছে। সাঁতার শেষ করে অনেকেই তখন চুল পর্যন্ত আঁচড়ে ফেলেছে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ঢাকুরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সারা বছরের কার্যকলাপের বিবরণ পাঠ করে চলেছে একঘেঁয়ে সুরে। কেউ লক্ষ্যই করল না শেষ প্রতিযোগীর সীমায় পৌঁছানোটা।

পাড়ের কাছে কাদা। কোনির পায়ের গোছ কাদায় ডোবা, শরীরটা সামনে ঝোঁকানো, পাড়ে উঠতে গিয়ে সেই অবস্থাতেই সে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটি লাল। সস্তার একটা কালো কস্ট্যুম শীর্ণ দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে। হাঁপাচ্ছে, পিঠের দিকে পাঁজরের হাড়গুলো চামড়ার নীচে বারবার কেঁপে উঠছে। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু; সরু লম্বা হাত দুটো ঝুলছে কাঁধ থেকে। একটু দূরে নীলশার্ট পরা রুগ্ন যুবকটি দাঁড়িয়ে, মনোযোগে লাউডস্পিকারে কান পাতার ভান করে।

টলতে টলতে কোনি উঠে এল। ওর বয়সিই দুটি ছেলে একটু জোরেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল।

''তবু তো শেষ করেছে।''

''পরের বছরের কম্পিটিশনে প্রথম প্লেস পেত যদি আর একটু দেরিতে পৌঁছত।''

কোনি আর একবার তাকাল। নীলশার্ট পরা যুবকটির মুখ চড় খাওয়া মানুষের মতো অপ্রতিভ, অপমানিত।

''সাঁতার শিখবে?''

চমকে কোনি পিছনে ঘুরল।

সেই লোকটা। কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। পুরু কাঁচের চশমা।

''লাল কস্ট্যুমপরা মেয়েটি সাঁতার শিখেছে তাই তোমাকে হারাল। তুমিও ওকে হারাতে পারবে যদি শেখো।''

হঠাৎ কোনির দু'চোখ জলে ভরে এল। থরথরিয়ে ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল। তারপরই চোয়াল শক্ত হয়ে বসে গেল।

ক্ষিতীশের চাহনির দপ করে ওঠা শুধু ভেলোই লক্ষ করল এবং অস্বস্তিভরে সে মাথা নাড়ল।

''ওই যে দাঁড়িয়ে, ও কে?''

''আমার দাদা।''

নিজেকে টানতে টানতে কোনি ড্রেসিংরুমের দিকে চলে গেল। ক্ষিতীশ এগিয়ে গেল কোনির দাদাকে লক্ষ করে।

''আমি একজন সাঁতারের কোচ। আমার নাম ক্ষিতীশ সিংহ। আমি আপনার বোনকে সাঁতার শেখাতে চাই।''

ক্ষিতীশ কোনো ভূমিকা না করে সোজাসুজি কথাগুলো বলল।

''আমার নাম কমল পাল। আমি একসময় সাঁতার কেটেছি অ্যাপোলোয়। তখন আপনাকে আমি দূর থেকে দেখতাম।'' কমল তার পাণ্ডুর অসুস্থ চোখ দুটোয় ঔজ্জ্বল্য আনার চেষ্টা করল। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলল, ''আমরা খুবই গরিব। সাঁতার শেখবার পয়সা নেই।''

''আমাকে পয়সা দিতে হবে না।''

''তা বলছি না। সাঁতার শিখতে হলে খরচ আছে, খাওয়া-দাওয়ার খরচ। আমি পারিনি সেইজন্য, পয়সা ছিল না খাওয়ার। বাবা প্যাকিং কারখানায় কাজ করত, টি বি-তে মারা গেল। সাঁতার কেটে এসে খিদেয় ছটফট করতুম। স্কুলে ঘুমিয়ে পড়তুম। বাবা মারা যেতে স্কুল ছাড়লুম সাঁতার ছাড়লুম। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল।''

''কী করেন আপনি?''

''আপনি বললে লজ্জা পাব।''

''বেশ। তুমি কী করো, বাড়িতে আর কে কে আছেন?''

''সাত ভাই-বোন, মা। আমি বড়ো, গত বছর মেজো ভাই ট্রেনের ইলেকট্রিক তারে মারা গেছে, সেজো কাঁচরাপাড়ায় পিসির বাড়িতে থাকে। তারপর কোনি আর দু-বোন এক ভাই। আমি রাজাবাজারে একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করি, ওভারটাইম করে শ' দেড়েক টাকা পাই, তাতেই সংসার চলে। থাকি শ্যামপুকুরে বস্তিতে।''

কমল হাঁপিয়ে পড়ল এই কটি কথা বলেই। ভিতরে ভিতরে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোনো কুণ্ঠা বা সংকোচ না করে সাধারণভাবেই নিজেদের অবস্থার কথা বলল। ওর হাঁপিয়ে ওঠার ধরনটা ক্ষিতীশের ভালো লাগল না। ওর বাবা টি বি-তে মারা গেছে, এটা মনে পড়ে অস্বস্তি বোধ করল।

“নামকরা সাঁতারু হবার সখ আমার ছিল। কোনিটাকে দেখতুম ছোটো থেকেই ওর খেলাধুলোয় আগ্রহ। আমার ইচ্ছে করে ওকে কোনো একটা খেলায় দিই। গঙ্গায় সাঁতার কাটে শুনেছি, দেখিনি কখনো। দিনরাত টো টো করে শুনেছি ছেলেদের সঙ্গে। অনেকে অনেক কথা বলে আমাকে। আমি তো বাড়িতে ফিরি শুধু ঘুমোবার জন্য। কে কী করছে কিছুই জানি না। তবু মাথা গরম হয়ে উঠলে দু-চার ঘা লাগাই। এর বেশি ওদের জন্য আমি আর কিছু করতে পারি না। ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাঁতার শেখাবার সামর্থ্য আমার নেই।”

“সে দায়িত্ব আমার।”

“তার মানে?” ভেলো ব্যস্ত হয়ে এতক্ষণে মুখ খুলল। “দায়িত্ব তোমার মানে?”

“মানে বলতে যা বোঝায় তাই।” ক্ষিতীশ বিরক্তি জানিয়ে কমলকে লক্ষ করে বলল, “গার্জেনরা সাহায্য না করলে কোনো ছেলেমেয়েকে শুধু কোচিং দিয়ে বড়ো করা যায় না। আমি শুধু বাড়ির সহযোগিতাটুকু চাই। বাদবাকি দায়িত্ব আমার।”

“আপনি দায়িত্ব নেবেন, সে তো ভাগ্যের কথা।” কমলের চোখের পাণ্ডুরতা চকচক করে উঠল। “কিন্তু আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না। ধার করে কালকেই বারো টাকা দিয়ে কস্ট্যুম কিনে দিয়েছি। খুবই বাজে জিনিস। কখনো ওর সাঁতার দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। কথা দিয়েছিল, মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবেই। দেখলেন তো কী হলো!”

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল।

ভেলো বলল, “স্ট্রেংথই নেই, আদ্দেকের পর আর টানতে পারছিল না। ওকে এখন খুব খাওয়াতে হবে। তাই না ক্ষিদ্দা?”

“আমরা এখন চলি।”

ক্ষিতীশ পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল দূরে কোনি দাঁড়িয়ে। ফ্রক পরে। কাঁধে প্লাসটিকের ব্যাগ।

“আমার খুবই ইচ্ছে, ও সাঁতার শিখুক, বড়ো হোক, নাম করুক।” তারপর ইতস্তত করে কমল বলল, “আর, যতটুকু পারি টেনেটুনে চালিয়ে খরচ করার চেষ্টা করব।”

ওদিকে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। নাম ডাকা এবং হাততালির শব্দ লাউডস্পিকারে ভেসে আসছে।

“মেয়েদের মধ্যে প্রথম ......”

ক্ষিতীশ তাকিয়ে ভাইবোনের দিকে। প্রাইজ না নিয়ে চলে যাচ্ছে উলটো-দিকের পথ ধরে। ভাঙা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তায় পড়বে। কমল গলে বেরিয়েছে। কোনি কাত হয়ে মাথা নীচু করে। ঝটকা দিয়ে সে এবার ফিরে দাঁড়াল।

“...বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের হিয়া মিত্র। টাইম — পঁয়ত্রিশ মিনিট আঠারো সেকেন্ড।”

কোনি মাথা নামিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

“তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি ক্ষিদ্দা!”

“কী করে বুঝলি।”

“ওই পিলসুজমার্কা সিড়িঙ্গে, কেষ্ট তুলসীর মতো রং, খেতে পরতে পায় না, ওকে তুমি সাঁতার শেখাবে, আবার দায়িত্বও নেবে?”

“হ্যাঁ, তা না হলে কি শেখানো যায়?”

“দায়িত্ব, কথাটার মানে?”

“মানে, খাওয়া-পরার দায়িত্ব, মানসিক গড়ন, যেটা সব থেকে ইমপর্ট্যান্ট, তাই গড়ে তোলার দায়িত্ব, রেগুলার ট্রেনিং করানোর দায়িত্ব, এইসব আর কী।”

“তা হলে তো ওকে বাড়িতে এনে রাখতে হয়।”

“দরকার হলে রাখতে হবে। এককালে গুরুগৃহে থেকেই তো শিষ্যরা শিখতো। সিস্টেমটা খুব ভালো।”

“সিস্টেমের মধ্যে বউদির কথাটা মনে রেখেছো তো!”

ক্ষিতীশ রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। থেমে, কান পাতল লাউডস্পিকারে।

‘‘কনকচাঁপা পাল, আন-অ্যাটাচ্ড্। কনকচাঁপা পাল।’’ তারপর মৃদু ফিসফিস শোনা গেল, ‘‘বোধহয় চলে গেছে। থাক্ রেখে দাও।’’

ক্ষিতীশ দেখল, সবুজ ফিয়াটের ধারে লাজুক মুখে হিয়া দাঁড়িয়ে। আনন্দ ফেটে পড়ছে ওর দুই গালের টোলে। এক মহিলা বাক্সটা তুলে মেডেলটা দেখছে আর হাসছে। প্রণবেন্দু ওদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে। সুপুরুষ সুবেশ এক ভদ্রলোককে সে কী একটা বোঝাবার জন্য হাত পাড়ি দিয়ে বাটারফ্লাই স্ট্রোকের ভঙ্গি করল।

‘‘সামনের বছর দেখা যাবে।’’ নিজেকে উদ্দেশ করে আপন মনে ক্ষিতীশ বলল।

‘‘কিছু বলছ ক্ষিদ্দা?’’

ক্ষিতীশ জবাব দিল না।

‘‘শেখাবে যে, জল কোথায়? জুপিটারে তুমি আর ট্রেনার নও। তাহলে মেয়েটাকে কোথায় নামিয়ে শেখাবে? অন্য ক্লাবে তোমায় যেতেই হবে।’’

‘‘না, আমি জুপিটারেই ওকে শেখাবে। দেখি কে আমায় আটকায়। তার আগে আমাকে রোজগারে নামতে হবে রে ভেলো। এখন আমার টাকা চাই। বিষ্টু ধরের সঙ্গে দেখা করা দরকার।’’

ওরা তখন খেতে বসেছে।

হঠাৎ দরজায় ক্ষিতীশকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

‘‘তোমাকে দরকার, একটু বাইরে এসো।’’

কোনিকে লক্ষ্য করে, কথাগুলো বলে, সে দরজা থেকে সরে গেল। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সে দেখে নিয়েছে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, ফ্যান এবং সম্ভবত তার মধ্যে কিছু ভাত আছে আর তেঁতুল। পাঁচটি প্রাণী কলাই আর অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে বসে। ঘরে একটা তক্তপোশ। তোশক নেই, শুধু চিটচিটে ছোটো কয়েকটা বালিশ। দেয়ালে টাঙানো দড়িতে কিছু ময়লা জামা-প্যান্ট। খোলার চালের এই ঘরে একটি মাত্র জানালা, যার নীচেই থকথকে পাঁকে ভরা নর্দমা।

কোনি কৌতূহলী চোখে বেরিয়ে এল।

‘‘এই ফর্মটায় সই করে দাও, আর আজ বিকেলে আমার সঙ্গে জুপিটার ক্লাবে যাবে।’’

ফর্মটা হাতে নিয়ে কোনি যেন কেমন এক ফাঁপরে পড়ল। ‘‘কলম আছে আপনার কাছে?’’

ক্ষিতীশের কাছে নেই।

‘‘পেন্সিলে লিখলে হবে?’’

‘‘না, কালিতে সই করতে হবে।’’

কোনি ছুটে গিয়ে কোথা থেকে কলম জোগাড় করে আনল। ক্ষিতীশের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় কলম বাগিয়ে সে জানতে চাইল, ‘‘ইংরাজিতে না বাংলায়?’’

“যা খুশি।”

ধরে ধরে, বিড়বিড়িয়ে বানান করে কোনি ইংরেজিতেই সই করল। সেটা দেখে ক্ষিতীশ বলল, “কোন ক্লাশে পড়ো?”

“ফাইভে”

“স্কুলে যাও?”

“নাম কেটে দিয়েছে।”

“আজ ঠিক চারটের সময় কমলদিঘির পশ্চিম দিকের বড়োগেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোয়ালে, কস্ট্যুম সব নিয়ে যাবে।”

“তোয়ালে নেই।”

“আমি নিয়ে যাব। তুমি ঠিক সময়ে আসবে।”

ঠিক সময়েই কোনি হাজির ছিল। ক্ষিতীশ ওকে নিয়ে ক্লাবে ঢুকল। অফিস ঘরে হরিচরণ আর প্রফুল্ল বসাক। ক্ষিতীশ ফর্মটা প্রফুল্লের হাতে দিল। সেটা পড়ে প্রফুল্ল বলল, “সুইমার?”

“হ্যাঁ।”

“ট্রায়াল দিতে হবে।”

“তার মানে!” ক্ষিতীশ বিরক্ত হয়েই বলল, “আমি বলছি তাতে হবে না?”

“তা কী করে হয়! ক্লাবের একটা নিয়ম আছে তো। ট্রেনার যদি বলে তবেই সুইমার। যে-সে, যাকে-তাকে এনে সুইমার বলবে আর জলে নেবে যদি ডুবে যায় তখন আমরাই তো হাঙ্গামায় পড়ব।”

প্রফুল্ল কথাগুলো বলতে বলতে হরিচরণের দিকে তাকাল। জানালার বাইরে তাকিয়ে হরিচরণ তখন মুচকি হাসছে।

''যে সে! আমি তাহলে যে সে?'' ক্ষিতীশ বিড়বিড় করল থমথমে স্বরে। কোনি অবাক হয়ে দেখছে, দলে দলে ছেলেরা কস্ট্যুম পরে ক্লাব থেকে বেরোচ্ছে। তিন-চারটে মেয়েও আছে আর মধ্যে। বাইরে হই চই জলের ধারে 'নভিস' ছেলেদের।

''বেশ তাহলে ট্রায়াল নেওয়া হোক।''

হরিচরণ মুখ ফেরাল এতক্ষণে। কোনিকে আপাদমস্তক দেখে বলল, ''মেয়েটি কে?''

''আমার চেনা মেয়ে। গুড মেটিরিয়াল। স্ট্রোক শেখাতে হবে।''

''গুড মেটিরিয়াল!'' হরিচরণ ঠোঁট বেঁকিয়ে শব্দগুলো দুমড়ে মুখ থেকে বার করল। কোনিকে আর একবার দেখে নিয়ে, গম্ভীরস্বরে বলল, ''এ ক্লাবের কাউকে স্ট্রোক শেখাতে হলে, শেখাবে ক্লাবেরই ট্রেনাররা। কাল সকালে আসুক। বন্দনা কি টুনু ওর ট্রায়াল নেবে।''

ক্ষিতীশ কয়েক সেকেন্ড হরিচরণ ও প্রফুল্লর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ''আচ্ছা।''

বেরিয়ে এসে কোনি বলল, ''কী হলো, ভর্তি করাল না?''

''পরীক্ষা দিতে হবে। কোনি, আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা দিতে হবে।''

কথাটা বুঝতে পারল না কোনি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ''দুজনকেই! কেন, আপনি সাঁতার জানেন না?''

''সাঁতার নয়, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অপমান সহ্য করার।''

ক্ষিতীশ জলের ধারের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। দুটি ক্লাবের প্রায় চারশো ছেলে কমলদিঘিতে দাপাদাপি করছে, কয়েকটি মেয়েও আছে। দুটো ডাইভিং বোর্ডে কয়েকটি ছেলে। তারা জলে লাফাচ্ছে নিছকই লাফাবার জন্য। বিষণ্ণচিত্তে ক্ষিতীশ মাথা নাড়ল। কাজের কাজ কেউই করছে না। সুহাস জলে নামছে। একবার সে তাকাল মাত্র তার দিকে।

হরিচরণ ক্লাব অফিসের জানালা থেকে চেঁচিয়ে বলল, ''সুহাস, দুটো ফোর হানড্রেড, তারপর হানড্রেড বাটারফ্লাই, ব্যাক অ্যান্ড ব্রেস্টস্ট্রোক ইচ, মনে আছে তো?''

সুহাস ঘাড় নাড়ল।

ক্ষিতীশ হাসল। মাত্র এগারোশো মিটার, এই ট্রেনিংয়ে এরা উন্নতি করবে! তবে সুহাসের স্ট্রোক নিখুঁত। ক্ষিতীশ বলল, ''কোনি, ওই যে ছেলেটা জলে নামল ওকে লক্ষ করো দেখো কেমনভাবে হাত পাড়ি দেয়।''

কোনি একাগ্র হয়ে তাকিয়ে রইল সুহাসের সাঁতারের দিকে। ক্ষিতীশ এক সময় বলে উঠল, ''হাতটা মাথার ঠিক সামনে জলে ঢুকে সামনে চলে যাচ্ছে, তারপর নীচে নামছে, তারপর টেনে ঊরু পর্যন্ত আনছে। সব থেকে দরকার স্পিডে হাত চালানো। তার মানে এলোপাথাড়ি গঙ্গায় যেভাবে করো তা নয়। সুন্দরভাবে জলে হাতের ঢোকাটা আর শক্ত কবজি খুব দরকার। আসল স্পিডটা আসে কাঁধের, পিঠের আর হাতের মাসলের শক্তি থেকে। এজন্য তোমার একসারসাইজ করতে হবে। এই শক্তিটাকে গুছিয়ে কাজ করালে তবেই স্পিডটা আসবে। মাথাটা কীভাবে রয়েছে দেখেছ? তুমি যেমন এধার ওধার নাড়াও, সেই রকম করছে কি? মুখ জলে ডুবিয়ে কেমন এগোচ্ছে। শুধু নিশ্বাস নেবার জন্য মাথাটা, ওই দ্যাখো পাশে ঘোরাল। বেশি মাথা নাড়ালে স্পিড কমে যায়। কাঁধটা জল থেকে উঠে আছে।''

কোনি শুনছে কি শুনছে না বোঝা গেল না। সাঁতারুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে বলল, ''আচ্ছা ওই মেয়েটার নাম কী?''

ক্ষিতীশ একটু হতাশ হয়েই বলল, ''জানি না।''

''ওর কস্ট্যুমটা কীসের, গেঞ্জির?''

“নাইলনের — খুব দামি।”

“খুব সুন্দর রংটা।”

ক্ষিতীশ কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, “তোমাকে কিনে দেবো একটা —”

কোনি ঘুরে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

“যেদিন তুমি ওই রকম স্ট্রোক দিতে শিখবে।” ক্ষিতীশ আঙুল দিয়ে সাঁতরে যাওয়া সুহাসকে দেখাল।

কোনি তীক্ষ্ণ চোখে সুহাসের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “দু’দিনে শিখে নেব।”

“ভালো। কাল সকাল ঠিক সাড়ে ছটায় আজ যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, সেখানে দাঁড়াবে। কস্ট্যুম সঙ্গে আনবে। পাশ তুমি করে যাবেই সেজন্য ভাবছি না। কিন্তু স্ট্রোক শেখানোর ভার পান্না কি নির্মলের উপর যদি পড়ে তাহলে তো সব মাটি হয়ে যাবে।”

কিন্তু কোনি পাশ করেও ভর্তি হতে পারল না।

সকালে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে পরীক্ষা নেওয়া দেখল। কোনি অনায়াসে দু’শো মিটার সাঁতরাল, জলে দু-হাতে তুলে রইল, ঝাঁপ দিল ডাইভিং বোর্ডের নীচতলা থেকে।

বিকেলে অফিস ঘরে প্রফুল্ল তাকে বলল, “সম্ভব নয়, আর মেম্বার নেওয়া যাবে না, সেক্রেটারির স্ট্রিক্ট অর্ডার। জলে আর হাত-পা ছোঁড়ারও জায়গা নেই, এত ভিড়। আজকেই তো দুজনকে রিফিউজ করতে হলো।”

“তাহলে আগেই সেটা আমাকে বলা হলো না কেন?” ক্ষিতীশ রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও সামলে নিল।

“বলার কথাটা মনে ছিল না।”

বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসার মতো ক্ষিতীশ ক্লাব থেকে বেরিয়েই দেখল স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে হরিচরণ দাঁড়িয়ে। কথা বলছে দুটি ছেলের সঙ্গে।

“হরিচরণ” ক্ষিতীশ চিৎকার করে উঠল, “চিফ ট্রেনার হতে চেয়েছিলিস, হয়েছিস। এরপরও এসব কী হচ্ছে?”

হরিচরণ বিরক্তিভরে ফিরে তাকিয়ে বলল “কী আবার হচ্ছে?”

“আমার মেয়েটাকে ভর্তি করলি না কেন?”

“প্রফুল্লর কাছে যাও।”

“ওসব ছেঁদো ওজর অনেক শোনা আছে। তবে এই বলে রাখলুম, দেখবি ওই মেয়ে তোদের মুখে চুনকালি দেবে। সেদিন আপোসশ করবি।”

“ওই মেয়ে, যাকে কাল এনেছিলে! ভালো, ভালো, তাই দিক। একটা মেয়ে সুইমার বেঙ্গল পাচ্ছে তাহলে!”

“বেঙ্গল নয়, ইন্ডিয়া পাবে।” রেলিংয়ে ধরা মুঠোটা শক্ত করে নিজেকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ক্ষিতীশ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে যেতে লাগল, “ওলিম্পিকের গুল মেরে সুইমার তৈরি করা যায় না রে, ধরা একদিন পড়বিই।”

প্রফুল্ল ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল।

“কী আবোলতাবোল চিৎকার করছ ক্ষিদ্দা।”

“বেশ করছি। কর্পোরেশনের জমিতে আমি দাঁড়িয়ে। তোদের ইতরোমোটা শুধু দেখছি। মেয়েটাকে তোরা ভর্তি করলি না, ভেবেছিস আর বুঝি ক্লাব নেই। পৃথিবীতে শুধু জুপিটারই একমাত্র ক্লাব।”

“তা হলে যাও না অন্য ক্লাবে।” হরিচরণ চেঁচিয়ে উঠল। “ওই তো পাশেই একটা ক্লাব রয়েছে।”

“তাই যাব, তাই যাব।”

ক্ষিতীশ হন্‌হন্ করে এগিয়ে গেল অ্যাপোলোর দিকে। পিছনে জমে যাওয়া ভিড়টাকে উদ্দেশ্য করে প্রফুল্ল বলল, ''পাগল মশাই, পাগল।''

অ্যাপোলোর গেটে পৌঁছে সংবিৎ ফিরল ক্ষিতীশের। দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের প্রতি অবাক হয়ে ভাবল, এখানে আমি এলাম কেন? এরা তো জুপিটারের শত্রু। আমি কি নেমকহারাম হলাম!

ক্ষিতীশকে দেখতে পেল অ্যাপোলোর অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নকুল মুখুজ্জে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে এসে বলল, ''কী ব্যাপার, ক্ষিতীশ যে! তুই এখানে?''

হঠাৎ ক্ষিতীশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ''তোমাদের এখানে জায়গা হবে নকুলদা! জুপিটার আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।''

''যাঃ কি আজেবাজে বকছিস। তোকে তাড়াবে কে?''

''সত্যি বলছি নকুলদা, তাড়িয়ে দিয়েছে। আমায় টাকা পয়সা দিতে হবে না। একটা মেয়ে পেয়েছি, তাকে শেখাবার সুযোগটুকু দিও তা হলেই হবে।''

''ভেতরে আয়, আগে সব শুনি।''

''তার আগে বলে রাখি, আমি কিন্তু জুপিটারের লোক, অ্যাপোলো কোনোদিনই আমার ক্লাব হবে না।''

''তাহলে তোকে আমরা নেব কেন?''

''আমাকে নয়, মেয়েটাকে নাও। আমি ওকে শেখাব। ও যদি সম্মান আনে তাহলে সেটা হবে অ্যাপোলোর।''

''আচ্ছা আচ্ছা, ভেতরে চল।''

''আগে বলো, আমার শর্তে রাজি! অ্যাপোলোর তুমিই সব, তোমার কথায় ক্লাব ওঠে বসে। তুমি কথা দিলে তবেই ঢুকব।''

নকুল মুখুজ্জে কিছুক্ষণ স্থির চোখে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ''তোর জুপিটার থেকে বেরিয়ে আসা মানে আমাদের শত্রুর দুর্গের একটা খিলেন ভেঙে পড়া। অ্যাপোলোর ছাদের নীচে তুই আসিস, সেটাই আমাদের ভিকট্রি হবে। আচ্ছা কথা দিলাম।''

গেট অতিক্রম করার আগে ক্ষিতীশ একবার পিছন ফিরল। কমলদিঘির জলে ছায়া পড়েছে পশ্চিমের দেবদারু আর রাধাচূড়া গাছের। জুপিটারের বিরাট ঘড়িটার কালো ডায়ালে কাঁটা দুটো আবছা লাগল ক্ষিতীশের পুরু লেন্সে। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা মোচড় সে অনুভব করল। চিকচিক করে উঠল চোখ দুটো।

সেই রাতে ঘুম এল না ক্ষিতীশের। বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রাতটা কাটাল। বারবার একটা কথাই তার মনে পাক দিয়ে ফিরল: ''আমি কি ঠিক কাজ করলাম? অ্যাপোলোয় যাওয়া কি উচিত হলো?''

ভেলো উত্তেজিত হয়ে হাজির হলো সকালেই।

''ক্ষিদ্দা, তুমি অ্যাপোলোয় জয়েন করেছ? বেশ করেছ। তোমাকে তো সেই কবে বলেছিলুম, এটা হলো যুদ্ধ। ন্যায়-অন্যায় বলে যুদ্ধে কিছু নেই, শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার করে কোনো লাভ নেই।''

ক্ষিতীশ চুপ করে রইল।

''জুপিটারকে এবার শায়েস্তা করা দরকার। বুঝলে ক্ষিদ্দা, তুমি শুধু ওই নাড়ির সম্পর্ক-টম্পর্কগুলো একটু ভুলে যাও ....''

''ভেলো!''

ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত। পুরু লেন্সে ভেঙে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসবে। ভেলো এক পা পিছিয়ে গেল।

''আর একটা কথা যদি বলেছিস তো — ''

ভেলো বিড়বিড় করে বলল, ''আমার ভুল হয়ে গেছে। আমায় মাপ করো ক্ষিদ্দা।''

''না না না, কতবার বলব কনুইটা অতটা ভাঙবে না — হাতটা অমন তক্তার মতো লাফিয়ে উঠল কেন? উহুঁ উহুঁ ... হলো না, বাঁ হাতটা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ কাঁধটাও এগোচ্ছে আর ডান কাঁধটা পিছিয়ে যাচ্ছে, এতে স্কোয়ার শোল্ডার পোজিশানটা যে ভেঙে যাচ্ছে ... নে নে, আবার কর ... ওকি! জলের বাইরে হাত নিয়ে যাবার সময় শরীরের পাশের দিকটা বেঁকে তেউড়ে শুঁয়োপোকা চলার মতো হয়ে যাচ্ছে যে!... দ্যাখ আমাকে দ্যাখ। তোর কনুইটা কেন বাঁক খাচ্ছে না বোঝার চেষ্টা কর ... এইভাবে, এইরকম। আর হাতের আঙুল জল টানবার সময় ফাঁক করবি না। জলের ওপর থাবড়ে থাবড়ে হাত ফেলিস দেখেছি, ওভাবে নয়। পরিষ্কারভাবে সোঁত করে ঢুকে যাবে। আগে আঙুল তারপর কবজি থেকে পুরো হাতটা। আর নিশ্বাস নেওয়াটা ভালো করে বুঝেনে। যদি ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিস, তাহলে বাঁ হাতটার কবজি যখন জলে ঢুকছে তখন মাথা ঘোরাবি। মাথা নীচু রাখার জন্য থুতনিটা বুকের দিকে টেনে রাখবি। মাথার লাইন এধার ওধার হবে না। ডান হাতটা যখন উঠবে তার তলা দিয়ে উঁকি দেবে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে নিতে। আর ডান হাত যেই জলে ঢুকছে সেই সঙ্গে তোর মুখও আবার জলে ডুবছে। ... যা যা আবার কর। দু-হপ্তা হয়ে গেল এখনো একটা জিনিসও ঠিক মতো করতে পারলি না।''

জলের ধারে সিমেন্ট বাঁধানো সরু পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ সমানে বকবক করে চলেছে। কোনি পাড়ের ধারে খানিকটা সাঁতরায় আর থেমে ওর দিকে তাকায়। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে এই ব্যাপার চলেছে। এখন সাড়ে আটটা।

''আর পাচ্ছি না ক্ষিদ্দা।''

''কেন! বলেছিলি দু-দিনেই সুহাসের মতো স্ট্রোক শিখে নিবি। দু-দিন ছেড়ে তো সতেরো দিন হয়ে গেল।''

জলের মধ্যে দাঁড় সাঁতার কাটতে কাটতে কোনি চাপা রাগ নিয়ে বলল, ''করছি তো আমি। আপনি খালি হচ্ছে না হচ্ছে না বলেই যাচ্ছেন।''

''না হলে কী বলব, হচ্ছে?''

''হচ্ছেই তো।''

''কিচ্ছু হয়নি। যা বলছি আবার কর।''

''আমার ভালো লাগছে না।''

কোনি পাড়ের দিকে এগিয়ে এল। ক্ষিতীশ কী করবে ভেবে না পেয়ে বলল, ''স্ট্রোক শিখলে কিন্তু নাইলন কস্ট্যুম দেবো।''

''দরকার নেই আমার।''

বাঁধানো পাড়ে দু-হাতের ভরে কোনি জল থেকে উঠে এল। ক্ষিতীশ বুঝতে পেরেছে ওকে খাটাতে হলে জোরজবরদস্তিতে কাজ হবে না। কিছু একটা প্রাপ্তি যোগ না থাকলে ওকে উৎসাহিত করা যাবে না।

''উঠে পড়লি যে, ক্ষিদে পেয়েছে?''

কোনি কথা বলল না। এগিয়ে গেল রেলিংয়ের গেট লক্ষ করে।

‘‘ক্ষিদে তো পাবেই। ভাবছি দুটো ডিম, দুটো কলা আর দুটো টোস্টের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়।’’

কোনি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্ষিতীশ মনে মনে হিসেব করে দেখল, প্রায় এক টাকার ধাক্কা।

‘‘আজ থেকে?’’

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল। কোনি কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, ‘‘আমি কিন্তু বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাব।’’

ক্ষিতীশ একটু কৌতূহলী হয়েই বলল, ‘‘বাড়িতে কেন!’’

‘‘এমনিই। বাইরে আমি খাব না।’’

‘‘তাহলে আরো একঘণ্টা জলে থাকতে হবে।’’

ক্ষিতীশ কথাটা বলেই মনে মনে ব্যথিত হলো। লোভ দেখিয়ে ক্ষুধায় অবসন্ন কোনিকে আরো পরিশ্রম করানো অমানুষিক কাজ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো সাধ্যের বাইরে গিয়ে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবেই, নয়তো কিছুতেই সাধ্যটাকে বাড়ানো যাবে না। খাটুক, আরো খাটুক। যন্ত্রনায় ঝিমঝিম করবে শরীর, টলবে, লুটিয়ে পড়তে চাইবে যন্ত্রণার পাঁচিলের সামনে। আর তখন জেনেশুনেই চ্যালেঞ্জ দিতে হবে ওই পাঁচিলটাকে। এজন্য চরিত্র চাই, গোঁয়ার রোখ্ চাই।

‘‘... নাম নাম, দাঁড়িয়ে আছিস কেন। দুটো ডিম, দুটো কলা, দুটো মাখন টোস্ট।’’

যন্ত্রণা কী জিনিস সেটা শেখ। যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় না হলে, তাকে ব্যবহার করতে না শিখলে, লড়াই করে তাকে হারাতে না পারলে কোনোদিনই তুই উঠতে পারবি না।

‘‘... ঠিক আছে, ঠিক আছে, কনুই অতটা উঠবে না। মুখ ডুবিয়ে।’’

যন্ত্রণা আর সময় তোর অপোনেন্ট। ও দুটোকে আলাদা করা যায় না। যন্ত্রণাকে হারালে সময়কেও হারাতে পারবি। সময়কে হারালে পারবি যন্ত্রণাকে হারাতে।

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ মনে মনে কোনির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে। কমলদিঘিতে এখন সাঁতার কাটছে একমাত্র কোনি। মাঝখানের চওড়া ঘাটে তিনচারজন বাইরের লোক স্নান করছে। বাসন ধুচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। জুপিটার এবং অ্যাপোলোর নম্বর খোলা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মগুলো পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশ মিটারের ব্যবধানে। সেগুলো এখন জনশূন্য। শুধু জুপিটারের স্প্রিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিয়ে যাচ্ছে গোটাচারেক উটকো বাচ্চা ছেলে। জুপিটারের ক্লাবের বারান্দায় বেঞ্চে বসে দুটি লোক তেলে ভাজা খেতে খেতে গল্প করছে আর হাসাহাসি করছে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে।

অ্যাপোলো ক্লাবের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অমিয়া আর বেলা। কোনির সাঁতার দেখতে তারা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়ায়। অমিয়া দিন সাতেক পর আজ জলে নেমেছিল। কলেজের পরীক্ষার জন্য সে ব্যস্ত। অমিয়া না থাকলে বেলা নাকি ট্রেনিংয়ে জুত পায় না। দুজনে আজ আধ মাইল করে সাঁতরেছে।

‘‘কে রে মেয়েটা?’’ অমিয়া জিজ্ঞাসা করল।

‘‘ক্ষিদ্দার আবিষ্কার।’’ বেলা চোখ পাকিয়ে বলল, ‘‘শুনিসনি, হরিচরণদা কী বলছিল সেদিন? ক্ষিদ্দা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে জুপিটারকে ডাউন দেবে ওই মেয়েটাকে দিয়ে।’’

‘‘সে কিরে, ও তো এখনো হাতের টান দিতেই শেখেনি। সামনের বছরই আমি কিন্তু জুপিটারে ফিরে যাব। যেখানে ক্ষিদ্দা আছে সেখানে আমি নেই। পাঁচজনের সামনে ট্যাঁকোস ট্যাঁকোস করে কথা শোনাবে, ও আমার সহ্য হয় না।’’

‘‘আমিও তাহলে যাব।’’

দুজনে আর একবার কোনির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তখন অমিয়া হেসে বলল, ‘‘কম্পিটিশনে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা ধোয়া জল খাবে।’’

প্রায় পৌনে দশটা। বাজার নিয়ে ফিরতে আজ দেরি হবেই। ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে হাঁটছে, পিছনে কোনি। একটা অস্টিন ফুটপাথ ঘেঁষে ক্ষিতীশের পাশে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল বিষ্টু ধরের মুখ।

"ও ক্ষিতীশবাবু, আপনাকেই খুঁজছি যে। যে ইস্পিচটা লিখে দিলেন সেটা কেমন যেন ঠিক বাগে আনতে পাচ্ছি না, একটু ডিসকাসন করলে ভালো হতো। আজকেই তো বিকেলে সভা।"

"কিন্তু আমার যে এখুনি বাজার করে বাড়ি পৌঁছাতে হবে।"

"গাড়িতে উঠুন। বাজার সেরে গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে ডিসকাসটা করে ফেলব।"

বিষ্টু ধর মোটরের দরজা খুলে দিল। ব্যস্ত হয়ে ক্ষিতীশ গাড়িতে উঠছে, তখন জামায় টান পড়ল।

"খাবারের কী হবে!"

"ওহ্ তোর ডিম-কলা।" ক্ষিতীশ বিব্রত হয়ে, কী বলবে ভেবে পেল না।

"আমাকে বরং পয়সাটা দিয়ে দিন, কিনে নেব।"

কথা না বলে ক্ষিতীশ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কোনির হাতে দিয়ে বলল, "বিকেলে ঠিক সময়ে আসিস।"

গাড়ি চলতে শুরু করলে বিষ্টু ধর জিজ্ঞাসা করল, "কে মেয়েটা?"

"আমার ভবিষ্যৎ।" ক্ষিতীশ হেসে বলল।

লীলাবতী যথারীতি তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ রান্নার উদ্যোগ না করে বিষ্টু ধরকে নিয়ে বারান্দায় বসল। বিশু আর খুশি এগিয়ে এল ক্ষিতীশকে দেখে। বিষ্টু কুঁকড়ে গিয়ে বলল, "ও দুটোকে সরান। দেখলে গা শিরশির করে।"

বিড়াল দুটিকে ক্ষিতীশ ছোট্ট ধমক দিতেই ওরা বারান্দা থেকে নেমে গেল।

''দারুণ ট্রেনিং তো।''

''ওদের ভালোবাসি তাই কথা শোনে। ভালোবাসলে সবকিছু করিয়ে নেওয়া যায়, মানুষকে দিয়েও।''

''তার মানে মানুষ আর জানোয়ারকে একই লাইনে ফেলছেন।''

''তা কেন। জানোয়ার দেখলে মানুষের গা শিরশির করে, কিন্তু মানুষ দেখলে জানোয়ারের করে কিনা আমি জানি না।''

''অই অই, অমনি ত্যারাব্যাকা কথা শুরু হয়ে গেল।'' বলতে বলতে বিষ্টু ধর পকেট থেকে বক্তৃতা লেখা কাজগ বার করল। ''আমি দাগ দিয়ে রেখেছি জায়গাগুলো। রাস্তায় রবারের বল ফাইনাল, চিফ গেস্ট বিনোদ ভড়। বুঝলেন না, ওর দলের ছেলেরা থাকবে। ফস্ করে যদি কিছু প্রশ্ন করে বসে আর যদি জবাব দিতে না পারি তাহলে আওয়াজ খাব, বেইজ্জত হব।''

ক্ষিতীশ কাগজটা মন দিয়ে পড়ে বলল, ''হুঁ, কী জানতে চান?''

''ওই যে লিখেছেন 'ট্যালেন্ট ঈশ্বরের দান। সেটা ফুটিয়ে তোলা যায় কিন্তু তার বদলি হিসাবে কোনোকিছুই সে জায়গায় বসানো যায় না। যার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, সেটা যদি সে ব্যবহার না করে তাহলে তাকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করতে হবে।' কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে বহু ট্যালেন্টওলা লোক আছে, যারা শুধু খাওয়া-পরার ধান্দাতেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব আগে মানুষের দরকার বেঁচে থাকা, এটা তো মানেন?''

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল।

''রাশিয়া-টাশিয়ার বড়ো বড়ো খেলোয়াড়দের খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হয় না। গভরমেন তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে, স্টেটই তাদের সব কিছু দেয়। সেই রকম আমাদের দেশেও গভরমেনকে দেখা উচিত যাতে প্লেয়াররা খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এসব কথা একটু বলা দরকার, বুঝলেন না, পাবলিক এখন লেফটিস্ট ধরনের তো।''

''কিন্তু ভারত বা বাংলা তো কম্যুনিস্ট দেশ নয়, এখানে গণতন্ত্র। এখানে প্লেয়ারকে সব কিছুরই জন্য লড়তে হবে। গণতন্ত্রে এই স্বাধীনতাটা আছে — লড়াইয়ের স্বাধীনতা।''

''আপনি কী সব কিছুরই, মানে খাওয়া-পরার জন্যও জানোয়ারের মতো কামড়া-কামড়ি করে বাঁচতে চান?''

''মানুষ হিসেবে নিশ্চয় চাই না কিন্তু সুইমিং কোচ হিসেবে, হ্যাঁ চাই। আরামে সব জিনিস পাওয়া যায় না, বুঝলেন আপনার পাবলিককে বলবেন যে, একটা সুইমারকে খেটে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উঠতে হয়। পড়ুন পড়ুন লেখাটা পড়ুন তো।''

ক্ষিতীশ উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি শুরু করল। বিষ্টু ধর ভীরুচোখে ক্ষিতীশের দিকে এবং বিশু-খুশির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল — ''বিরাট বিরাট খেলোয়াড়ের গৌরবের ছটায় আলোকিত হয় তার দেশ; যদি প্রশ্ন করি, অস্ট্রেলিয়ার কথা উঠলে সব আগে কাদের নাম আপনার মনে ভেসে উঠবে? নিশ্চয় ডন ব্র্যাডম্যান, ডন ফ্রেজার, কেন রোজওয়ালের নাম। যদি বলি ব্রাজিলের প্রধান মন্ত্রীর নাম কী? পারবেন কেউ বলতে? কিন্তু পেলের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। ইথিওপিয়া ছোট্ট দেশ, গরিব দেশ, অখ্যাত দেশ। কিন্তু বিকিলা যখন দৌড়াল, দেশটা বিখ্যাত হয়ে গেল।''

বিষ্টু ধর দম নেবার জন্য থামল। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে পড়ে একমনে শুনছিল। বলল, ''কিন্তু শুধু মেডেল ধোয়া জল খেয়ে আপনার কী আমার চলবে না। মেডেল তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একটা দেশ বা জাতির কাছে মেডেলের দাম অনেক, হিরোর দাম অনেক। দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে একজন হিরো, সে সাঁতারুই হোক আর সেনাপতিই হোক, আদর্শ স্থাপন করে। তবু ওদের মধ্যে তফাত আছে, বড়ো সাঁতারু জীবনের ও প্রাণের প্রতীক, সেনাপতি মৃত্যুর ও ধ্বংসের। সাঁতারু অনেক বড়ো সেনাপতির থেকে। যুদ্ধজয়ী সেনাপতি সমীহ পায়, আবার ঘৃণাও পায়। কিন্তু বিরাট সাঁতারু সারা পৃথিবীকে প্রেরণা দেয়।''

''আপনি খালি সাঁতারু সাঁতারু বলছেন কেন, ফুটবলার ক্রিকেটার এদের নাম করুন। বাঙালিরা যা ভালোবাসে মিটিংয়ে তাই তো বলব।''

"যা খুশি বলুন, কিছু যায় আসে না। শুধু বলবেন, যারা আমাদের জন্য প্রাণ নিয়ে আসে, আমরা তাদের অবহেলা করি। ভুলে যাই তাদের খাদ্য দরকার, মাথার উপর ছাদ দরকার, খড়ের চালা যদি হয় তাও। আমরাই বাধ্য করি তাদের উঞ্ছবৃত্তি করতে। আমরাই তাদের শেখাই চালাকি করতে, মিথ্যে বলতে। ... এইসব বলার পর আপনার লাইনের কতাবার্তায় চলে আসবেন। খুব কড়া কড়া কথায় গভর্মেন্টকে এক হাত নেবেন।"

"তাহলে একটু গুছিয়ে লিখে দিন। আমার যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।"

ক্ষিতীশ ভ্রূকুটি করে তাকাল। বিষ্টু ধর তাড়াতাড়ি বলল, "এজন্য নিশ্চয়ই ফি দেবো।"

"ফি চাই না, একটা চাকরি চাই। যে-কোনো চাকরি, অন্তত শ'দেড়েক টাকার।"

"চাকরি!" বিষ্টু ধর অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "কোথায় পাব?"

"আপনার তো ব্যবসা আছে। আমার এখন নিয়মিত টাকা দরকার। এইভাবে, বক্তৃতা তো সারাজীবন লেখা যাবে না।"

"আচ্ছা আমি দেখব'খন।"

আধঘণ্টার মধ্যেই ক্ষিতীশ লিখে দিল। বিষ্টু ধর চলে যাবার পর রান্না চাপিয়ে দিল। উঠোনের দেয়ালে গাঁথা বড়ো হুকে রবারের দুটো দড়ির প্রান্ত আংটায় বেঁধে আটকাবার কাজে লেগে পড়ল। রবার দুটোর অপর প্রান্তে দুটো হাতল। এই রবার পুলি টেনে ব্যায়াম করবে কোনি। কাজটা শেষ করে সে ছোটো পাশ-বালিশের মতো চটের থোলে সের দশেক বালি দিয়ে ভরতে শুরু করল। ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামের সময় এই ওজন ঘাড়ে নিয়ে কোনিকে ব্যায়াম করতে হবে।

লীলাবতী বাড়িতে ঢুকে ক্ষিতীশের কাজ দেখে অবাক হয়ে বলল, "এগুলো আবার যে বার করলে ব্যাপার কী?"

"কোনির জন্য।"

"কে কোনি!"

"একটা মেয়ে। ওকে তৈরি করব, মেয়েটার মধ্যে জিনিস আছে। একেবারে আকাঁড়া মাটি, গড়তে পারলে দারুণ সুইমার হবে। তোমাকে এনে দেখাব। ভীষণ গরিব।"

লীলাবতী ঘরে ঢুকে গেল। ক্ষিতীশ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "ভীষণ গরিব, খেতে পায় না। ভাবছি এখানেই ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করব।"

ঘরের মধ্যে থেকে লীলাবতীর শুকনো কঠিনস্বর ভেসে এল, "ঘরটা নেওয়াই ঠিক করলাম। ওরা রাজি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা সেলামিতে, এখন টেনেটুনে চলতে হবে বাজে খরচ একদম বন্ধ।"

ক্ষিতীশ আর কথা বাড়াল না। বিকেলে অ্যাপোলোয় গিয়ে দেখল কোনি আসেনি। পরদিন সকালে কোনি এল আধঘণ্টা দেরিতে। ক্ষিতীশ রেগে তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কোনি বলল, "খাবারের বদলে বরং আমাকে রোজ একটা করে টাকা দেবেন।"

ক্ষিতীশের রাগটা মুহূর্তে অবাক হয়ে গেল।

"তার মানে? রোজ একটা করে টাকা দিতে হবে আমাকে তুই সাঁতার শিখবি বলে? এটা কি আমার পিতৃদায়?"

"অত খাটাবেন আর খেতে দেবেন না?"

কোনির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষিতীশ হেসে ফেলল, কোনিও হাসল। দুজনের মধ্যে নিঃশব্দে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

"তুই একটা আস্ত শয়তান। আমাকে চিনে ফেলেছিস দেখছি। দাঁড়া, তোকে আগে সাঁতারের মজাটা পাইয়ে দি, তারপর দেখব জলে নামিস কি নামিস না। এখন আমি তোকে খাটাচ্ছি, তখন তুই খাটার জন্য পাগল হয়ে উঠবি।"

কোনি কথাগুলো শুনল মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে। ক্ষিতীশ সেটা লক্ষ করে আবার বলল, "লেকে একমাইল সাঁতারে যে মেয়েটার কাছে হেরেছিস, তার নাম হিয়া মিত্র। নামটা মনে রাখিস।"

কোনির চোখ দুটো সরু হয়ে এল। মুখ ঘুরিয়ে সে কস্ট্যুমের কাঁধের পটি ঠিক করতে লাগল।

''মনে রাখিস, অমিয়া বলেছে তোকে পা ধোয়া জল খাওয়াবে।''

কোনি ঘুরে দাঁড়াল। শীর্ণ দেহটা ঝাঁকিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, ''কস্ট্যুম সাত দিনে আমি আদায় করব। কিন্তু লাল রঙের আমি পরব না, আমার রং কালো।''

অমিয়া আর বেলা পঞ্চাশ মিটার কোর্সে কিকিং বোর্ড নিয়ে প্র্যাকটিস করছে। কোনি পাড়ের কাছাকাছি। ক্ষিতীশ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। দু-চোখে শুধু অনুমোদন আর কণ্ঠে বিড়বিড়: 'হারামজাদি কোথাকার, আমাকে নিয়ে এতদিন রসিকতা হচ্ছিল! দাঁড়া, তোর ওষুধ আমি পেয়েছি — হিয়া মিত্তির।'

''ক্ষিতীশ, চলছে কেমন?''

নকুল মুখুজ্জে রেলিংয়ে দু-হাত রেখে শুকনো গলায় বলল, ''তুই কি কিছুই খবর রাখিস না! বি এ এস -এর সিলেকশন কমিটি থেকে আমাকে আউট করে দিয়েছে। এ সবই জুপিটারের ধীরেনের কারসাজি। এদিকে অ্যাপোলোর আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। দু-একটা টাকাওলা লোক জোগাড় করে দিতে পারিস, প্রেসিডেন্ট করে রাখব।''

ক্ষিতীশের হঠাৎ মনে পড়ল বিষ্টু ধরকে। বলল, ''চেষ্টা করব। কিন্তু নকুলদা, বি এ এস এ থেকে আউট হয়েছ বলে দুঃখ পাচ্ছ কেন! একটা ক্লাব ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের থেকে। ক্লাবই সুইমার তৈরি করে, ওরা করে মোড়লি।''

''কিন্তু মোড়লদের দলাদলি ঝগড়া প্রতিপত্তির লোভ সুইমারের জীবন শেষ করে দিতে পারে।'' নকুল মুখুজ্জে হেসে উঠে বলল, ''জেনে রাখ এবার অ্যাপোলোর কেউ বেঙ্গল টিমে আসছে না, শুধু ওই দুটো মেয়ে ছাড়া।'' আঙুল দিয়ে সে অমিয়া আর বেলাকে দেখাল। ''ওরা, জেনে রাখ, সামনের বছরই জুপিটারে ফিরে যাচ্ছে।''

নকুল মুখুজ্জে চলে যাবার পর ক্ষিতীশ আবার কোনির দিকে মন দিল।

''হাঁটু ভেঙে পায়ের পাড়ি ... হাঁটু ভেঙে। বলে দিয়েছি না, পা যখন পিছনে ঠেলবি তখন হাঁটু ভাঙবে, ওঠার সময় সোজা থাকবে।''

এই পর্যন্ত চিৎকার করে বলেই তার মনে হলো, অমিয়া বা বেলা শুনে নিয়ে যদি এইভাবে কিকিং শুরু করে! তারপরই ভাবল, এখন আর ওদের পক্ষে আদ্যিকালের সিজার-কিক্ ছেড়ে এই শক্ত কিকিংয়ে আসা সম্ভব নয়। তা হলেও, শুনে নিয়ে ওরা হরিচরণকে বলে দিতে পারে। হরিটা অন্যদের এইভাবে শেখাবে হয়তো।

হাত নেড়ে ক্ষিতীশ ডাকল কোনিকে। পাড়ের কাছাকাছি আসতেই ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, ''যা বলছিলুম হচ্ছে না কেন? গোড়ালিটা টান্‌টান্ থাকবে...এই রকম পিছন দিকে টান করে ঠেলে রাখবি। আর কিক্ করার সময় যতটা না নীচের দিকে, তার থেকে পিছন দিকেই পায়ের ধাক্কা বেশি দিতে হবে। এইভাবে শোলান্ডার সাঁতার কেটে চারটে গোল্ড জিতেছে টোকিওয়। ..... আবার কর..... সিক্স বিট, এক চক্কর হাত পাড়ি আর সেইসঙ্গে ছ'টা করে পা মারবি ... করে যা করে যা।''

ট্রেনিং শেষে ফেরার পথে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, ''তোর দাদার খবর কী রে, আসতে বলিস একদিন। দেখে যাক কেমন তুই শিখছিস।''

কোনি জবাব দিল না। ক্ষিতীশ লক্ষ করল ওর মুখটা কেমন যেন করুণ আর গম্ভীর হয়ে উঠল।

''দাদার অসুখ হয়েছে। দু-দিন কাজে যায়নি।''

''তাহলে তো দেখতে যেতে হয়। আচ্ছা পরে একদিন দেখতে যাব। আর শোন আজ বিকেলে তোর ওজনটা নেব। এবার থেকে একসারসাইজ শুরু করতে হবে। খাওয়াও বাড়াতে হবে। ট্রেনিং চার্ট ডায়াট চার্ট আমি তৈরি করেছি। ভিটামিন কী কী লাগবে সেটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব। হেমোগ্লোবিন লেভেল যদি পারি তো টেস্ট করাব।''

ক্ষিতীশ কথা বলতে বলতে বাজারের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা টাকা কোনির হাতে দিয়ে বাজারের দিকে এগোচ্ছে, কোনি ডাকল —

"ক্ষিদ্দা, আর দুটো টাকা দেবেন? তাহলে দু'দিন আর আমায় দিতে হবে না।"

"টাকা? কীসের জন্য?" ভ্রূ কুঞ্চিত হল ক্ষিতীশের।

"চাল কিনব। দাদা তো কাজে যেতে পারছে না।"

কোনি চুপ করে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে রইল।

প্রশ্ন না করে ক্ষিতীশ আরো দুটি টাকা দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝেও গেল, প্রতিদিন ডিম-কলা খাওয়ার জন্য যে টাকা দিয়েছে সেটা কীসে ব্যয় হয়।

ঘণ্টাখানেক পরই ক্ষিতীশ হাজির হলো কোনিদের ঘরের দরজায়। তক্তপোশে ময়লা ছেঁড়া কাঁথার উপর কমল শুয়ে। একদৃষ্টে জানালার বাইরে তাকিয়ে। সব ছোটো ভাইটে আর মা উনুনে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির সামনে বসে। ঘরে আর কেউ নেই। ক্ষিতীশ গলা খাঁকারি দিতে কমল তাকাল, অবাক হলো এবং উঠে বসতে গিয়ে দুর্বলতার জন্য টলে পড়ল।

"আসুন। একটু আগেই কোনি বলছিল আপনি একদিন আসবেন। কী আর দেখবেন আমায়!" কমল চট করে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দেখার আর কিছু নেই। আমি ফিনিশ হয়েই গেছি।"

ক্ষিতীশ তক্তপোশের ধার ঘেঁষে বসল।

"কী হয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা?"

মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে কমল মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আপনি কিন্তু বেশিক্ষণ বসবেন না। ছোঁয়াচে রোগটা।"

"ওষুধ খাচ্ছ?"

কমল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "কোনির দ্বারা কিছু হবে কি? ও আমাকে রোজ বলে কী কী শিখল। খুব রোখা মেয়ে। যদি বলে করব, তাহলে করবেই। ওকে দিয়ে যদি করাতে পারেন, ওর একটা ভবিষ্যৎ যদি গড়ে দিতে পারেন —"

"হবে। প্রথম প্রথম একটু চঞ্চল ছটফটে থাকে, মন বসলে আমার মনে হয় ও কিছু একটা পারবে।"

"একটা ভাইকে চায়ের দোকানের কাজে দিয়েছি, পনেরো টাকা মাইনে। কোনিকে একটা সুতোর কারখানায় লাগিয়ে দোব ভাবছি। কথাবার্তা বলেছি, ষাট টাকা দেবে। কিন্তু ওর সাঁতার তাহলে আর হবে না।"

কোনি ঘরে ঢুকল। ক্ষিতীশকে দেখে অবাকই হলো। দাদার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে কমলের মাথায় হাত রাখল।

"আমি চাই না কোনি সাঁতার বন্ধ করুক। আমার নিজের খুব ইচ্ছে হতো বড়ো সাঁতারু হব, অলিম্পিকে যাব। আমার দ্বারা কিছুই হলো না, এখন যদি কোনি পারে। আপনি বলছেন, ওর হবে?"

ক্ষিতীশ গম্ভীর স্বরে বলল, "যদি খাটে, যদি ইচ্ছে থাকে।"

"কী রে, শুনলি তো।" কমল মুখ উঁচু করে তাকাল। "ইচ্ছে থাকলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ইন্ডিয়া রেকর্ড ভাঙতে হবে তোকে। তারপর এশিয়ান, তারপর অলিম্পিক। পারবি না?"

কমলের স্বর অদ্ভুত করুণ একটা আবেদনের মতো শোনাল। কোনির মুখে ধীরে ধীরে অস্বস্তি, তারপর চাপা ভয় ফুটে উঠল। ঘরের মধ্যে তখন কেউ কথা বলছে না। হাঁড়িতে ভাত ফোটার শব্দটা শুধু সেই মুহূর্তে একমাত্র জীবন্ত ব্যাপার।

কমল আবার বলল, "পারবি না?"

কোনি আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল।

ক্ষিতীশ সারা সকাল অ্যাপোলোয় অপেক্ষা করেছে, কোনি আজও আসেনি। গত দু-সপ্তাহে একবেলাও সে কামাই করেনি। ক্ষিতীশ ভয়ে রয়েছে, এই বুঝি কস্ট্যুম দাবি করে বসে। এখনো সে সমানে বলে যাচ্ছে, ‘‘হয়নি হয়নি, ইঞ্চিখানেকের বেশি জল থেকে হাত উঠবে না। .... অতটা পাশের দিকে হাত যাচ্ছে কেন — ওকি, দুটো হাত ঠিকমতো সমানে চলছে না কেন?’’

বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ মাথা নাড়ে। আর ভাবে কস্ট্যুম আজই কিনতে হবে দেখছি। কখনো কখনো সে জলে নেমে সাঁতার কেটে স্ট্রোক দেখিয়ে দেয়। ওদের পাশ দিয়েই অন্যরা সাঁতার কেটে যায়, বেলা গড়িয়ে যায়, কমলদিঘির জল জনশূন্য হয়ে আসে। কোনি যখন বিরক্ত হয় ওঠে, ক্ষিতীশ বলে, ‘‘দাদার কাছে তো খুব ঘাড় নেড়েছিলিস! ভিকট্রি স্ট্যান্ডে ওঠা খুব সহজ ব্যাপার ভেবেছিস! রেকর্ড করাটা গঙ্গায় আম কুড়োনো নয়, বুঝলি?’’ ফেরার পথে গল্প করেছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সাঁতারুর, তাদের আন্তরিকতার, নিষ্ঠার, পরিশ্রমের।

অপেক্ষা করে অবশেষে ক্ষিতীশ বেরিয়ে পড়ল অ্যাপোলো থেকে। বিষ্টু ধরের বাড়ি পৌঁছাল মিনিট দশেকের মধ্যে। তাকে দেখেই বিষ্টু ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘‘এই একটু আগে দর্জিপাড়া বয়েজ লাইব্রেরির লোকেরা এসেছিল ওদের অ্যানুয়াল সোশ্যালে চিফ গেস্ট করার জন্য। প্রেসিডেন্ট হবে কে জানেন? ঐ বিনোদ ভড়। আমি রাজি হয়ে গেছি। ওখানে দারুণ একটা ইস্পিচে ওকে ডাউন দিতে হবে। বুঝলেন, ক্ল্যাপ ওকে পেতে দোব না।’’

বিষ্টু ধরের উত্তেজিত মুখ দেখে ক্ষিতীশ চটপট মতলব ভেঁজে নিয়ে বলল ‘‘শুধু একটা বক্তৃতায় ডাউন দিয়ে কী লাভ হবে। লোকে কিছুদিন মনে রেখে তো ভুলে যাবে। তার থেকে এমন একটা কিছু দরকার, যাতে বিনোদ ভড় রেগুলার ডাউন খায়।’’

‘‘কী রকম?’’ বিষ্টু কৌতূহল দেখাল। ‘‘রেগুলার ডাউন কীভাবে সম্ভব!’’

‘‘ভাবতে হয়েছে, তিনদিন ধরে ভেবেছি।’’ ক্ষিতীশ নিজেকে গুরুত্ব দেবার জন্য গলার স্বর ভারিক্কি করে তুলল। ‘‘ভেবে দেখলুম বিনোদ ভড় যে যে অর্গানাইজেশনে আছে, তার পাল্টাগুলোয় ঢুকতে হবে। ও যদি ড্রামা ক্লাবে থাকে, আপনাকেও ড্রামা ক্লাবে ঢুকতে হবে। ও যদি কোনো হরিসভার পৃষ্ঠপোষক হয়, আপনাকেও একটি হরিসভায় ঘাঁটি করতে হবে। ও যদি কোনো সুইমিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয় .....’’

‘‘আছে!’’ বিষ্টু ধর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘জুপিটারের প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড়।’’

ক্ষিতীশ মাথা হেলিয়ে বলল, ‘‘আপনাকে জুপিটারের রাইভাল ক্লাবে ঢুকতে হবে।’’

‘‘সেটা তো অ্যাপোলো। কিন্তু ঢুকব কী করে?’’ বিষ্টু ধর বিমর্ষ গলায় বলল। ‘‘পারেন একটা কিছু করে দিতে?’’

‘‘চেষ্টা করতে হবে। আজও আমি নকুল মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলেছি। সাত হাজারের কমে রাজি হচ্ছে না।’’

‘‘সাত হাজার! মানে?’’

‘‘মানে, প্রেসিডেন্ট হতে গেলে ডোনেশন তো দিতে হবে। অমনি অমনি কি আর হওয়া যায়। বিনোদ ভড়ও তলায় তলায় চেষ্টা করছে ওর দাদাকে অ্যাপোলোয় ঢোকাবার জন্য। পাঁচ হাজার পর্যন্ত অফার করেছে।’’

‘‘কিন্তু সাত হাজার! কমসম করা যায় না?’’

‘‘কত কমাবেন? পাঁচ হাজার অফার তো পেয়েই গেছে। বিনোদ ভড় এম এল এ, মন্ত্রী হবারও চান্স খুব, ওকে তো সবাই হাতে রাখতে চাইবে। আপনি যদি বেশি টাকা না দেন তাহলে ওদের লাভটা কী হবে বলুন?’’

‘‘তা তো বটেই।’’ বিষ্টু ধর চিন্তিত হয়ে পেটে হাত বুলোতে লাগল।

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ করে আবার বলল, ‘‘দেরি করলে চলবে না। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে হবে। বিনোদের পার্টি উঠে-পড়ে লেগেছে।’’

‘‘বেশ সাত হাজারই দোব। কিন্তু ....’’

বিষ্টু ধরের কথা শেষ হবার আগেই চাকর ঘরে ঢুকে জানাল, একজন মাইজি দেখা করতে এসেছে।

এরপর ক্ষিতীশকে অবাক করে ঘরে ঢুকল লীলাবতী। ক্ষিতীশকে এখানে দেখে সেও অবাক। তবে কোনো কথা বলল না।

‘‘টাকাটা এনেছি।’’ লীলাবতী তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে বিষ্টু ধরকে বলল।

ব্যস্ত হয়ে বিষ্টু বলল, ‘‘পাশের ঘরে আসুন, আপনার রসিদ-টসিদ সব রেডি করা আছে।’’

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরই বিষ্টু একা ঘরে ফিরে এল। ক্ষিতীশ তখন কৌতূহলে ফেটে পড়ার মতো অবস্থায়।

‘‘কী ব্যাপার, কীসের টাকা?’’

‘‘ওই একটা ঘর ভাড়া নেওয়ার ব্যাপার। হাতিবাগানে আমার একটা বাড়িতে এরা দোকান করবে টেলারিং শপ। তাই কিছু টাকা দিয়ে গেল।’’

‘‘পাঁচ হাজার টাকা!’’

বিষ্টু ধর চমকে উঠল। ‘‘কী করে জানলেন!’’

‘‘টাকাটা যার কাছ থেকে নিলেন, সে আমার স্ত্রী। ওর কাছ থেকে সেলামি নেওয়া মানে আমার কাছ থেকেই নেওয়া।’’

বিষ্টু ধর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ক্ষিতীশের গম্ভীর মুখ দেখে। তোতলা স্বরে বলল, ‘‘আমি তো তা জানতাম না।’’

‘‘আমিও জানতাম না আপনিই বাড়িওলা। যাই হোক, এবার আমরা দুজনেই জানলাম। জানার পর, আপনি কি টাকাটা এখন নেবেন?’’

বিষ্টু আরো তোতলা হয়ে গেল। ‘‘ইয়ে এটা তো ব্যবসার ব্যাপার.. আমাকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।’’

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল। ‘‘চলি। বিনোদ ভড় কোর্টে বেরিয়ে গেছে। তা রাত্তিরেই দেখা করব ওর সঙ্গে।’’

‘‘না না, প্লিজ যাবেন না।’’

‘‘হাজার দুয়েক টাকা ডোনেশন আর একটা নাইলনের কি বেলনের কস্ট্যুম কেনার জন্য একশো টাকা যদি দিতে পারেন তা হলে গ্যারান্টি দিচ্ছি অ্যাপোলোর প্রেসিডেন্ট করে দেবোই। তবে এই সেলামির টাকাটা ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া বক্তৃতাও আমি আর লিখে দিতে পারব না।’’

বিষ্টু ধর চূর্ণ বিচূর্ণ। কথা বলার আর ক্ষমতা নেই। দুটি চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। শুধু মাথাটি নেড়ে বলল, ‘‘গাছে অনেক দূর উঠে গেছি। মই কেড়ে নিলে নামতে পারব না।’’

বিষ্টু ধর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একশো টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে ফিরে, সেটা ক্ষিতীশের হাতে দিয়ে বলল, ‘‘উনি আপনার স্ত্রী হন তো?’’

‘‘আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!’’

বিষ্টু জিভ কেটে কান মুলল। ক্ষিতীশ আর অপেক্ষা করল না। বেরিয়ে আসছে, তখন শুনল বিষ্টু কাতর কণ্ঠে বলছে, ‘‘আমার বক্তৃতাটার কী হবে!’’

“দেবো দেবো, লিখে দেবো।”

বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশ নোটের বান্ডিলটা নিজের বাক্সে রেখে দিয়ে ভাবতে শুরু করল, এবার কী করবে! টাকাগুলো লীলাবতীকে ফেরত দিতেই হবে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু আদায়ও করে নিতে হবে। এবং তা করতে হবে কোনিরই জন্য।

লীলাবতী বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, “ওখানে তুমি কী করছিলে?”

“মাঝে মাঝে যাই বুদ্ধি পরামর্শ দিতে। তুমি কেন গেছিলে?”

“ওর কাছ থেকেই তো ঘর নিয়েছি। সেলামির টাকাটা দিতে গেছলুম।”

ক্ষিতীশ হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে বলল, “আগে যদি আমায় বলতে তাহলে টাকাটা দিতে হতো না। আমি বারণ করলে বিষ্টু ধরের সাধ্যি নেই টাকা নেবার, তবে বললে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবে।”

“দ্যাখো না একবার বলে, অনেকগুলো টাকা। দেবার সময় গা করকর করছিল।” লীলাবতী ব্যগ্র হয়ে বলল।

“কিন্তু কোনিকে যে ওর বাড়িতেই খাওয়ার ব্যবস্থা করব ভাবছিলাম। এরপর কি অতগুলো টাকা ফেরত দেবার কথা বলা যায়! মেয়েটাকে যে খাটাব, তার জন্য কিছু তো করতে হবে! দাও গামছাটা, চান করে আসি।”

বিকেলে লীলাবতী অন্য মূর্তি ধরে বলল, “পরের মেয়ের জন্য তো খুব মাথা-ব্যথা। আর আমি যে এত কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করালাম, তিল-তিল করে টাকা জমিয়ে ব্যবসাটা বড়ো করার চেষ্টা করছি, তাতে একটু সাহায্যও কি করবে না!”

ক্ষিতীশ বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বলে গেল, “আচ্ছা দেখছি।”

অ্যাপোলোয় সারা বিকেল অপেক্ষা করল ক্ষিতীশ, কোনি এল না। নকুল মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা হলো।

“প্রেসিডেন্ট পেয়েছি, কত টাকা ডোনেশন চাও নকুলদা?”

নকুল একটু হকচকিয়ে বলল, “কত টাকা মানে? এখন বটুবাবু পাঁচশো দিচ্ছে, তাও টিপে টিপে দেয়।”

“ঠিক আছে। আমি দু'হাজারি ধরেছি।”

ক্ষিতীশ তারিয়ে তারিয়ে নকুল মুখুজ্জের অবস্থাটা লক্ষ করার পর বিষ্টু ধর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে বলল, “কিছু ভেব না তুমি, টাকা এসে যাবে। তবে আমার ওই মেয়েটার পুরো ট্রেনিং ফেসিলিটি দিতে হবে কিন্তু।”

নকুল মুখুজ্জে একগাল হেসে মাথাটা হেলিয়ে বলল, “নিশ্চয়।”

অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ ভাবল, মেয়েটা কেন আজ এল না, একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। বড্ড ফাঁকিবাজ। কিছুর একটা লোভ না দেখালে খাটতেই চায় না। তবে একটা দুর্বলতা আছে, সেটা ওর অপমানবোধ। ক্ষিতীশের প্রায়ই মনে পড়ে, প্রাইজ না নিয়ে লেক থেকে কোনির চলে আসা আর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার বিজয়ীর নামটি শোনার সেই ভঙ্গিটি। দাদার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে থাকা মেয়েটি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল।

বস্তির মধ্যে আলো নেই। ক্ষিতীশ একটু অসুবিধায় পড়ল ঘরটা খুঁজে বার করতে। অবশেষে একটা বাচ্চা ছেলে তাকে দেখিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে কুপি জ্বলছে। কোনির ছোটো ভাই দুটো মেঝেয় ঘুমিয়ে। তক্তপোশে সম্ভবত ওর মা শুয়ে। ক্ষিতীশ ডাকল, “কোনি।”

ঘর থেকে নিঃশব্দে কোনি বেরিয়ে এল।

“ব্যাপার কী তোর! আজ যাসনি কেন? এভাবে কামাই দিলে আর তাহলে যেতে হবে না। তোর দাদাকে আমি জানিয়ে দেবো, হবে-টবে না কিছু তোর দ্বারা।” বিরক্তস্বরে ক্ষিতীশ বেশ জোরেই কথাগুলো বলল।

কোনি কথা না বলে একইভাবে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ক্ষিতীশের পিছন থেকে খনখনে স্বরে কে বলে উঠল, ‘‘কেমন লোক গা তুমি, কাল রাতে মেয়েটার দাদা মরে গেল আর তুমি এখন তাকে ধমকাতে নেগেছ?’’

ক্ষিতীশ প্রথমে বুঝতে পারেনি সে কী শুনল। পিছনে তাকিয়ে বলল, ‘‘কে মরে গেছে?’’

‘‘জানো না দেখছি! কাল বিকেল থেকে মুখে অক্ত উঠল, ভলকে ভলকে, রাত্তিরেই কাবার। কোনির দাদা গো!’’

ক্ষিতীশ বার দুয়েক কেঁপে উঠল এবং শুনল কোনি খুব ক্লান্ত এবং শান্ত স্বরে বলছে, ‘‘ক্ষিদ্দা, এবার আমরা কী খাব?’’

রাগে চিৎকার করে উঠল ক্ষিতীশ, ‘‘পারতেই হবে, পারতেই হবে। কোনো কথা শুনব না।’’

পায়ের কাছে পড়ে থাকা ঢিলটা তুলে সে কোনির দিকে ছুঁড়ে মারল।

‘‘পায়ে পড়ি ক্ষিদ্দা, আর আমি পারছি না।’’

‘‘মাথা ফাটিয়ে দোব তোর.. মরে যা তুই, মরে যা, মরে যা।’’ ক্ষিতীশ ঢিল খুঁজে পেল না। এধার ওধার তাকিয়ে মালির ঘরের গায়ে দাঁড় করানো সরু বাঁশের লগাটাকে দেখতে পেল।

‘‘ক্ষিদ্দা, আমি আর পারব না।’’

ক্ষিতীশ রেলিং টপকে ছুটে গিয়ে লগাটা আনল। কোনি পাড়ের কাছে এগিয়ে এসেছে। ক্ষিতীশ দু’হাতে লগাটা তুলে জলে আঘাত করল। কোনির মুখের হাত তিনেক সামনে সেটা পড়ল। আবার সে লগাটা দু’হাত উঁচু করে জলে আঘাত করল।

‘‘মাথা ভেঙে দেবো। জল থেকে উঠবি তো মরে যাবি। এখনো দুশো মিটার বাকি।’’

কোনি জল থেকে ওঠার জন্য পশ্চিমের স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে এগোতেই ক্ষিতীশ লগা তুলে পাড় ধরে ছুটল। কোনি থমকে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের কিনার ধরে উঁকি দিতে লাগল। ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্মে উঠতে পারছে না, কেননা পাড় থেকে সেটা অন্তত বারো হাত দূরে এবং মাঝে কোনো সেতু নেই।

‘‘ক্ষিদ্দা ক্ষিদ্দা, আমায় এবেলা ছেড়ে দাও। ওবেলা আমি পুষিয়ে দোব।’’ কোনি ফোঁপাচ্ছে।

‘‘কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমার রুটিন অনুযায়ী কাজ চাই। যতক্ষণ না কাজ পাচ্ছি আজ তোকে উঠতে দোব না।’’

প্ল্যাটফর্ম ধরা দু-হাতের মধ্যে মুখটা গুঁজে কোনি কাঁদছে। ক্ষিতীশ পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে। সকাল ন’টা বেজে গেছে। কমলদিঘির জলে আর কেউ নেই এখন। বেঞ্চগুলোয় অনেকেই বসে, কমলদিঘির ভিতরের পথ দিয়ে পথিকের আনাগোনা। তাদের অনেকে কৌতূহলে তাকাচ্ছে ক্ষিতীশের দিকে। কেউ কেউ দাঁড়িয়েও পড়ছে।

কোনি সাঁতরাচ্ছে। পশ্চিম থেকে পুবের প্ল্যাটফর্মের দিকে। ক্ষিতীশও লগা হাতে পাড় ধরে পুবদিকে হাঁটছে। বিশ্বাস নেই, ওপারে পৌঁছেই কোনি জল থেকে উঠে পড়তে পারে।

ওর ক্লান্ত হাত দুটো যেন কেউ জল থেকে টেনে তুলে আবার নামিয়ে রাখছে। মুখ ফিরিয়ে হাঁ করে বাতাস গিলছে। তখন চোখ দুটো দেখাচ্ছে যেন ঘুমে আচ্ছন্ন। গলায় ঝোলান স্টপওয়াচটা মুঠোয় ধরে ক্ষিতীশ বিড়বিড় করে আপন মনে বকে যাচ্ছে:

জানি রে জানি কষ্ট হচ্ছে, হাত-পা খুলে খুলে আসছে, কলজে ফেটে যাচ্ছে। যাক যাক, তুই যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যা। তুই জানিস ক্ষিদে যখন থাবা মারে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তখন কেমন লাগে। তুই পারবি বুঝতে যন্ত্রণা কী জিনিস। ফাইট কোনি ফাইট —

...মার খেয়ে ইস্পাত হয়ে উঠতে হবে। যন্ত্রণাকে বোঝ, ওটাকে কাজে লাগাতে শেখ, ওটাকে হারিয়ে দে। ...কাম অন কোনি, জোর লাগা, আরো জোরে —

...ট্রেনিং করে করে নিজেকে বাড়াতে হবে কোনি। যন্ত্রণাকে তুই বল, 'দেখে নেব আমাকে কাঁদাতে পারিস কিনা, আমাকে ভয় দেখাতে পারিস কিনা', বলে যা কোনি, 'ক্ষিদ্দা তোমাকে খুন করব। তুমি শয়তান, ছিঁড়ে খাব তোমাকে।' কমলদিঘিকে টগবগ করে ফুটিয়ে তোল তোর রাগে।

..... মানুষের ক্ষমতার সীমা নেই রে, ওরা পাগলা বলছে, বলুক। মূর্খ, মূর্খের দল সব। ঘণ্টাখানেক আরামে হাত-পা ছুঁড়িয়ে ওরা চ্যাম্পিয়ন বানাবার স্বপ্ন দেখে। .... ট্রেনিং ট্রেনিং —

— আরো পঞ্চাশ মিটার এখনো যেতে হবে, শরীরটাকে যন্ত্রণায় ঘষে ঘষে শানিয়ে তোল। দেখবি কী অবাক তোকে করে দেবে ওই শরীর, যা অসম্ভব ভাবছিস তাকে সম্ভব করে দেবে। সোনার মেডেল-ফেডেল কিছু নয় রে, ওগুলো এক একটি চাকতি মাত্র। ওগুলোর মধ্যে যে কথাগুলো ঢুকে আছে সেটাই আসল — মানুষ পারে, সব পারে।

কোনি সাঁতার শেষ করে দু-হাতে প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁপাচ্ছে মাথা নীচু করে। একবার সে মাথা ঘুরিয়ে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। দু-চোখে ঘৃণা আর আক্রোশ। ক্ষিতীশ সেটা লক্ষ করল। লগাটা যথাস্থানে রেখে সে ক্লাবে ঢুকে একটা মোটা খাতা খুলে বসল। এটা কোনির লগ-বুক। প্রতি বেলার ট্রেনিং-এ কাজের ও সময়ের হিসাব ছাড়াও খাওয়ার, ওজনের, নাড়ির স্পন্দনের, রক্তের হেমোগ্লোবিন স্তর পরীক্ষার, আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেটের তালিকাও এতে লেখা আছে।

লগ-বুকে লিখতে লিখতে ক্ষিতীশ দেখল কোনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ক্লাব থেকে। প্রতিদিন বেরোবার আগে একবার 'যাচ্ছি' বলে যায়। আজ বলল না। ক্লাব থেকে কোনি যায় ক্ষিতীশের বাড়ি। সেখানেই ওর খাওয়া। ঠিক দশটায় তাকে 'প্রজাপতি'-র রোলার শাটারের তালা খুলতে হয়। দোকান ঝাঁট দিয়ে, কাউন্টার মুছে, কুঁজোয় জল তুলে, তাকে ফাইফরমাশ খাটতে হয়। দুপুরে আবার আসে ভাত খেতে। তখন ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে পনেরো মিনিট ব্যায়াম করে অ্যাপোলোয় যেতে হয়। সাঁতার থেকে আবার প্রজাপতিতে। দোকান বন্ধ করে সে লীলাবতীর সঙ্গে ফেরে। রাত্রে খেয়ে ফিরে যায় বস্তিতে মা ও ভাইদের কাছে। কোনি মাইনে পায় চল্লিশ টাকা।

আজ কোনির দেরি হয়ে গেছে। ক্ষিতীশের বাড়ি না গিয়ে, সে প্রায়ে ছুটতে ছুটতে প্রজাপতিতে এল। লীলাবতী নিজেই দোকান খুলেছে। পাশের ফোটোগ্রাফি দোকানের ছেলেটি ভারী শাটারটা তুলে দিয়ে গেছে। লীলাবতী ওকে দেখেই রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল, ''বেরিয়ে যাও। তোমায় আর দরকার নেই।''

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কোনির মুখ। মুখ নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। এই সময় খদ্দের আসায় লীলাবতী আর কিছু বলল না। কোনি একে একে তার কাজগুলো করে গেল। ক্লান্তিতে এবং খিদেয় তখন সে ঝাপসা দেখছে, পা টলছে। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে কিন্তু দোকানে বসার মতো জায়গাও তার জন্য নেই। একবার সে ভয়ে ভয়ে লীলাবতীকে বলল, ''বউদি, একটু বাড়ি যাব?''

বিরাট একটা মোটা খাতার উপর ঝুঁকে ফ্রকের মাপ লিখতে লিখতে লীলাবতী কড়া স্বরে বলল, ''না''।

কোনি সরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। কাজটা থেকে বরখাস্ত হলে চল্লিশটা টাকা থেকে তাদের সংসার বঞ্চিত হবে।

ওদিকে ক্ষিতীশ বড়ো একটা থলি হাতে অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে তখন একটার পর একটা দর্জির দোকান ঘুরছে কাপড়ের ছাঁট কেনার জন্য। তিনটে লন্ড্রির সঙ্গে তার বন্দোবস্ত হয়েছে। মার্কা দেওয়া নম্বর টুকরো কাপড়ে লিখে জামাকাপড়ে বেঁধে কাঁচতে পাঠাবার জন্য লন্ড্রিগুলোর দরকার হয় এই ছাঁট। ছাঁট থেকে সমান মাপে কাপড় টুকরো করে কেটে ক্ষিতীশকে বিক্রি করতে হয়। ওরা দৈনিক প্রায় তিন কিলো কেনে। ক্ষিতীশ টাকা ছয়-সাত লাভ করে।

দুপুর প্রায় একটা নাগাদ ক্ষিতীশ ছাঁট ভর্তি থলি নিয়ে কোনিদের ঘরের দরজায় হাজির হলো। কোনির মা বেরিয়ে আসতেই

সে ঝাঁজিয়ে উঠল, ''কাল রাতে কোনি কখন ঘুমিয়েছিল?''

''কেন, রোজ যেমন সময়ে ঘুমোয়।'' জড়োসড়ো হয়ে কোনির মা বলল।

''ঠিক বলছ?'' ক্ষিতীশ তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। ''আজ এতো তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ল কেন তাহলে? দ্যাখো মেয়ে, আমার কাছে কিছু লুকোলে কিন্তু ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ঠিক করে বলো, কখন কোনি ঘুমিয়েছে?''

''না বাবা, আপনার কাছে মিছে বলব না। কাল রাতে কোনি যাত্রা শুনতে গেছল। রাত একটা নাগাদ ফিরে শুয়েছে।''

''হুঁ।'' থলিটা এগিয়ে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, ''এগুলো কেটে রেখো আজই, কাল সকালে কোনির হাত দিয়ে ক্লাবে পাঠিও।''

পাঁচ টাকা কোনির মার হাতে দিয়ে, ফেরার আগে ক্ষিতীশ বিষণ্ণ স্বরে বলল, ''ছোটো মেয়ে, ওর তো সখ হবেই। কিন্তু ওর ভালোর জন্যই তোমাকে কড়া হতে হবে। যেকোনো খেলা সাধনার জিনিস। সিদ্ধিলাভ করতে হলে সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করতে হবে। বহু ছোটোখাটো ব্যাপার আছে সাধনার পক্ষে যা ক্ষতিকর। যাত্রা নিশ্চয় দেখবে, কিন্তু এখন এই ট্রেনিংয়ের সময় বিশ্রাম নষ্ট করে নয়। এগুলো তোমায় বুঝতে হবে।''

বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশ দেখল লীলাবতী অপেক্ষা করছে। তখুনি সে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে খুবই সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করল, ''কোনি খেয়েছে?''

লীলাবতী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ''ওকে দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না, ঝিমোয় শুধু। বসতে দিই না, দাঁড়িয়েই আজ ঘুমোচ্ছিল।''

"আজ ওকে খুব খাটিয়েছি।"

"তাতে আমার কী লাভ। পাঁচ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে অন্যদিক থেকে সেটা নিয়ে নিচ্ছ।"

"ওর খাওয়ার জন্য তো মাসে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।"

"রোজ দুধ ডিম মধু, মাসে পঞ্চাশ টাকায় কি হয়!"

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। ঘরে এসে দেখে কোনি মেঝেয় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বালিশের বদলে দুটি হাত জড়ো করে মাথার নীচে রাখা। ক্ষিতীশ ওর পাশে বসে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই কোনি নড়ে উঠে আরো গুটিশুটি হয়ে সরে এল ক্ষিতীশের দিকে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। ক্ষিতীশ ঝুঁকে পড়ল শোনার জন্য।

"দাদা?"

"হ্যাঁ।"

একটা পাতলা হাসি কোনির মুখে চারিয়ে গেল। "আমায় কুমির দেখাবে বলেছিলে।"

"দেখাব, চিড়িয়াখানায় তোকে নিয়ে যাব।" ফিসফিস করে ক্ষিতীশ বলল। "আরো অনেক জায়গায় আমরা যাব — বেলুড় মঠ, ব্যান্ডেল চার্চ, ডায়মন্ড হারবার, জাদুঘর, অনেক অনেক জায়গায়। তারপর তুই যাবি দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজ; তারপর যাবি আরো দূরে টোকিও, লন্ডন, বার্লিন, মস্কো, নিউইয়র্ক।"

ঘুমের মধ্যেই কোনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ক্ষিদ্দা আমাকে কষ্ট দেয় দাদা। আমি ঠিক মেডেল এনে দোব তোমায়।"

কোনি মুখে হাসি নিয়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল। ক্ষিতীশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "তোকে আরো কষ্ট দেবো রে, আরো দেবো।"

রবিবার প্রজাপতি বন্ধ থাকে। সেদিন কোনির ট্রেনিংয়েও ছুটি। ক্ষিতীশের কাঁধে ঝুলছে থলি। তাতে আছে, কাগজের মোড়কে রুটি, আলু ছেঁচকি, গুড়, সিদ্ধডিম আর কলা।

ওরা দুজন বাড়ি থেকে দশটায় বেরিয়েছে। চিড়িয়াখানায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে পুকুরধারে ঘাসে বসেছে। ক্ষিতীশ খাবারের মোড়ক দুটো বার করে বলল, "জল খাওয়াটাই মুশকিল হবে। ওয়াটার বটলটা আনলে হতো।"

ওদের থেকে কিছু দূরে স্কুল ইউনিফর্ম পরা জনা তিরিশ মেয়ে হইচই করে হাজির হলো। সঙ্গে চারজন টিচার। দুজন দারোয়ান খাবারের ঝুড়ি বয়ে আনল। ওরা গোল হয়ে খেতে

বসেছে। কোনি কৌতূহলভরে মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। আর রুটি চিবোচ্ছে।

‘‘ক্ষিদ্দা, ওদের কাছে জল আছে। চাইব?’’

‘‘কী করে বুঝলি?’’

‘‘ওই তো বড়ো ড্রামটা থেকে জল দিচ্ছে।’’

‘‘দ্যাখ তাহলে।’’

কোনি এগিয়ে গেল ড্রামের কাছে দাঁড়ানো টিচারের দিকে। ক্ষিতীশ দেখল, কোনি তাকে কিছু বলতেই তিনি কোনিকে আপাদমস্তক দেখে মুখ ফিরিয়ে কী একটা জবাব দিলেন। তাইতে কোনি অপ্রতিভ হয়ে ফিরে এল।

‘‘দিল না তো।’’

কোনির মুখটা থমথমে। শুধু বলল, ‘‘বড়োলোকদের মেয়েদের স্কুল।’’

‘‘তাই দিল না বুঝি!’’ ক্ষিতীশ কৌতুকের সুরে বলল।

‘‘বড়োলোকরা গরিবদের ঘেন্না করে।’’

ক্ষিতীশ এবার একটু অবাক হলো। এইসব ধারণা এইটুকু কোনির মাথায় ঢুকল কী করে!

‘‘তোকে কে বলল, বড়োলোকরা গরিবদের ঘেন্না করে?’’

‘‘আমি জানি। দাদা আমায় বলেছিল, টাকা থাকলেই সবাই খাতির করে।’’

‘‘চল, জল খেয়ে আসি কল থেকে।’’

ওরা দু-চার পা এগিয়েছে, তখনই একটি মেয়ে ‘‘শুনুন, শুনুন’’ বলতে বলতে ছুটে এল। হাতে জলভরা প্লাস্টিকের দুটি গ্লাস।

ওরা ঘুরে দাঁড়াল। এবং দুজনেই চিনতে পারল জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি হিয়া মিত্র।

‘‘আপনারা জল চেয়েছিলেন না? আমাদের মিস নন্দী বড্ড কড়া মেজাজের। ওর ব্যবহারের জন্য মাপ চাইছি।’’

হিয়া জলভরা একটা গ্লাস এগিয়ে ধরল কোনির সামনে। কোনি তখন অদ্ভুত আচরণ করে বসল। ধাঁ করে সে গ্লাসে আঘাত করল হাত দিয়ে। গ্লাসটা হিয়ার হাত থেকে ছিটকে ঘাসে পড়ল। হতভম্ভ শুধু হিয়াই নয়, ক্ষিতীশও।

‘‘চাই না তোমাদের জল। আমাদের কলের জলই ভালো।’’

কোনি হন হন করে একাই এগিয়ে গেল। ক্ষিতীশ অপ্রতিভ হয়ে বলল, ‘‘আমি মাপ চাইছি এবার তোমার কাছে।’’

হিয়া ব্যথিত মুখে বলল, ‘‘এই গ্লাসের জলটা তাহলে আপনি খান।’’

‘‘নিশ্চয় নিশ্চয়।’’

কোনিকে দারুণ বকবে ভেবেছিল ক্ষিতীশ। কিন্তু সে কিছুই বলেনি। হিয়াই যে কোনির ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী এটা ক্ষিতীশ বুঝে গেছে। বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবে চারদিন সে গেছে নিছকই পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার ভান করে। হিয়ার ট্রেনিং সে দেখেছে। শুধু তাই নয়, পকেটে হাত ঢুকিয়ে লুকিয়ে স্টপওয়াচে হিয়ার পুরো দমে সাঁতারের সময় নিয়েছে। ক্ষিতীশের মনে হয়েছে, হিয়ার প্রতি কোনির হিংস্র আক্রোশটা ভোঁতা করে দেওয়া ঠিক হবে না। এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক। এটাই ওকে উত্তেজিত করে বোমার মতো ফাটিয়ে দেবে আসল সময়ে।

ক্ষিতীশ তাই বকুনি দেওয়ার বদলে বলেছিল, ‘‘হিয়া তখন আমাকে কী বলল জানিস? বলল, মেয়েটা আমার কাছে মার খেয়েছে তাই জ্বলে পুড়ে মরছে।’’

এরপর ক্ষিতীশ লক্ষ করল কোনি জল থেকে উঠতে দেরি করছে।

দুর্গা পুজোর আগেই ক্লাবগুলোর প্রতিযোগিতা একটার পর একটা হয়ে গেল। ক্ষিতীশ একটিতেও কোনিকে নামায়নি, এমনকি অ্যাপোলোর প্রতিযোগিতাতেও নয়। যদিও এখন তার সময় অমিয়ার সময়ের প্রায় সমান, তবু ক্ষিতীশের ধারণা এখনো তার প্রকাশের উপযুক্ত সময় আসেনি। হিয়ার সময় এখন কত, সেটা না জানা পর্যন্ত কোনিকে সে বার করতে চায় না। এখন অনেকেই জেনে গেছে ক্ষিতীশ একজন সাঁতারু তৈরি করছে। বালিগঞ্জ ক্লাবে সে গেলেই প্রণবেন্দুর নির্দেশে হিয়া এমনভাবে সাঁতার কাটে কিংবা জলে থেকে উঠে পড়ে, যার ফলে ক্ষিতীশ ওর সময় নিতে পারে না। হিয়াও কোনো প্রতিযোগিতায় নামেনি। তাইতে ক্ষিতীশ কিছুটা ভাবনায় পড়ল। প্রত্যেক ক্লাবের, এমনকি স্টেট চ্যামপিয়নশিপের ভিকট্রি স্ট্যান্ডেও অমিয়া আর বেলাকে উঠতে দেখা গেল।

একদিন খবরের কাগজে একটা খবর দেখে ক্ষিতীশ কেটে রেখে দিল। বোমবাইয়ের মহারাষ্ট্র স্টেট চ্যামপিয়নশিপে রমা যোশি নামে একটি মেয়ে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সময় করেছে এক মিনিট ১২ সেকেন্ড। এক-কুড়ির উপরে সময় করাই ভারতীয় মেয়েদের রেওয়াজ, সেখানে এক-বারো! ক্ষিতীশ এরপর কোনির ট্রেনিং আরো কঠিন করে তুলল।

এবার জাতীয় সাঁতার চ্যামপিয়নশিপ দিল্লিতে। পুজোর পর বাংলা দল রওনা হয়ে গেল। অমিয়া মেয়েদের দলের অধিনায়িকা। বাংলার মেয়েরা একটি সোনা, দুটি রুপো, দুটি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরল। সোনাটি অমিয়ার, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে। রমা যোশি একাই ছয়টি সোনা জিতল চারটি ব্যক্তিগত রেকর্ড করে।

শীত এসে গেছে। কমলদিঘির জলও কমে গেছে। সোয়েটার পরা লোকেরা এখন সেখানে বেড়ায়। কেউ আর জলে নামে না। কিন্তু অব্যাহত কোনির দুবেলা জলে নামা। আপত্তি করেছিল অনেকেই। ক্ষিতীশ জবাবে শুধু বলেছে, ''যদি পারে তাহলে নামবে না কেন? সারা বছরই ট্রেনিংয়ে থাকা দরকার। প্র্যাকটিশ চাই, প্র্যাকটিশ। মুভমেন্টগুলো যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক হয়ে আসে। তা না হলে স্পিড বাড়ানো যাবে না। এদেশে মাত্র ছ'মাস সাঁতার হয়, তাই তো এই শোচনীয় দশা।''

কোনিকে বাকি তিনটি স্ট্রোকও ক্ষিতীশ ইতিমধ্যে শিখিয়ে দিয়েছে। ফ্রি স্টাইল, বাটার ফ্লাই, ব্যাক এবং ব্রেস্ট এই চার রকমের স্ট্রোক মিলিয়ে কোনি এখন দিনে দু'মাইল হাড়ভাঙা সাঁতার কাটে। কঞ্চির মতো শরীরটার ওজন বেড়ে হয়েছে ৫০ কেজি।

বছর ঘুরে নতুন বছর এল।

একদিন ভেলো, প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়ানো ক্ষিতীশকে বলল, ''ক্ষিদ্দা, এ বছর ওকে কম্পিটিশনে নামাবে তো?''

ক্ষিতীশ তখন কোনির দুটো পায়ের গোছ বাঁধছিল রবারের দড়ি দিয়ে। পা বাঁধা অবস্থায় শুধু মাত্র হাতের পাড়িতে ওকে 'পুল' করতে হবে। ক্ষিতীশ অন্য মনস্কের মতো বলল, ''সিজন শুরু হয়ে গেছে?''

''সিজন কী তোমার জন্য বসে থাকবে নাকি। কর্পোরেশন তো অনেকদিন কমলদিঘিতে জল ছেড়েছে, হুঁশ নেই —''

ভেলো কথা থামিয়ে ফেলল। ক্ষিতীশ হাত তুলে রয়েছে। কোনি স্টার্টিং পজিশনে।

“অন ইওর মার্ক .... গেট সেট .....” ক্ষিতীশ হাতটা নামাল। কোনি ঝাঁপাবার সঙ্গে সঙ্গে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে বলল, “কী বলছিলিস?”

“হরিচরণরা ভয় পেয়ে গেছে।”

ভেলোর ধারেকাছে কেউ নেই, তবু সে এধার ওধার তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, “অমিয়া ও বেলা জুপিটারে আবার চলে এসেছে তো, সে খবর রাখো কি? ওদের ট্রেনিং চার্ট তৈরি করছে হরিচরণ। অমিয়া বলছে অতো ট্রেনিং লোড নিতে পারব না। তাই নিয়ে হরির সঙ্গে তক্কাতক্কি হয়েছে। হরি বলেছে, যদি ক্ষিদ্দার মেয়েটার হাতে মার না খেতে চাস তো হার্ড ট্রেনিং আরম্ভ কর।”

“করেও কোনো লাভ নেই। কোনি এখন যে টাইম করছে, অমিয়ার পক্ষে সেখানে পৌঁছনো সম্ভব হবে না।”

“তা হলে এবার ওকে জুপিটারের চ্যামপিয়নশিপে নামিয়ে, অমিয়াকে মার খাওয়াও। মনে আছে কী বলে অপমান করেছিল!”

জলে কোনির দিকে চোখ রেখে ক্ষিতীশ জবাব দিতে ভুলে গেল। ভেলো ধড়মড়িয়ে বলল, “যা বলতে এসেছিলুম সেটাই বলা হয়নি। আর একটা দরজির দোকান ঠিক করেছি। দিনে প্রায় হাপ কেজি মাল হয়। ওরা তোমার জন্য রেখে দেবে, তুমি কালই যেও। এই নাও ঠিকানাটা।”

ভেলো চলে যাবার পর ক্ষিতীশ স্টার্টিং ব্লকের উপর বসে ওর কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল। তখনই দেখল ধীরেন ঘোষ আর বদু চাটুজ্জে কমলদিঘির পশ্চিম গেট দিয়ে ঢুকে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

“ক্ষিদ্দা দেখছি উঠে-পড়ে লেগেছে। কদ্দুর হলো?”

ক্ষিতীশ যথাসম্ভব নিরাসক্ত হবার চেষ্টা করে ধীরেনকে বলল, “কীসের কদ্দুর!”

“এই তোমার চ্যাপিয়ন তৈরি করার। এবার দিল্লিতে দেখলুম বোমবাইয়ের রমা যোশিকে। অসাধারণ, ফ্যান্টাস্টিক। ইন্ডিয়ায় এ রকম মেয়ে সুইমার কখনো হয়নি।”

“হ্যাঁ, ভালোই টাইম করেছে।” ক্ষিতীশ নিষ্প্রাণস্বরে বলল।

“তোমার এই গঙ্গা থেকে কুড়োনো মেয়েটা কেমন টাইম করছে?” বদু চাটুজ্জে নস্যির ডিবেটা রেলিংয়ে ঠুকে ঢাকনিটা খুলতে খুলতে বলল, “ডন ফ্রেজারের টাইম ধরে ফেলেছে?”

“আর একটু বাকি আছে। কাল পরশুই ধরে ফেলবে।” ক্ষিতীশের চোখ জোড়া মিটমিট করে উঠল।

কোনি তখন কিকিং বোর্ড ধরে স্প্রিন্ট করে যাচ্ছে। বদু চাটুজ্জে সেদিকে তাকিয়ে বলল, “ঠাট্টা করলে আমার সঙ্গে!”

“ঠাট্টা! জলে নেমে এক বছরেই ডনের টাইম ধরে ফেলেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সিরিয়াস কথার পর কি ঠাট্টা চলে? “আগে অমিয়াকে বিট করুক, তারপর বড়ো বড়ো ব্যাপার ভাবা যাবে।”

“তা বটে।” ধীরেন ঘোষ বিজ্ঞের মতো বলল। “তবে অমিয়াকে বিট করা আর সম্ভব হলো না। এইটেই ওর লাস্ট সিজন। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, বিয়ের পরই চলে যাবে কানাডায়।”

ক্ষিতীশ সচকিত হয়ে উঠল। কোনি যদি অমিয়াকে না হারায়, তাহলে বিরাট একটা অপূর্ণতা ক্ষিতীশের জীবনে যেন রয়ে যাবে। চিরকাল যেন তাকে অতৃপ্ত থেকে যেতে হবে।

“তাহলে কোনিকে এবার তো নামিয়ে জানতে হয় বেঙ্গল চ্যামপিয়নের থেকে কত পিছনে রয়েছে।”

''না না, তা করতে যেও না।'' বদু চাটুজ্জে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ''সবে শুরু করছে। বাচ্চা মেয়ে এখুনি বড়ো রকমের মার খেয়ে গেলে সেটব্যাক হবে। তাতে ওর ক্ষতিই হবে।''

''হোক। তবু তো পরে বলতে পারবে, অমিয়ার পা ধোয়া জল খেয়েছি।''

সেইদিনই নকুল মুখুজ্জেকে ক্ষিতীশ জানাল, এবার জুপিটারের কম্পিটিশনে কোনির এন্ট্রি অবশ্যই যেন দেওয়া হয়।

ক্ষিতীশ এবার আরো সতর্ক, আরো হিসেবি, আরো কঠিন হলো কোনির ট্রেনিং সম্পর্কে। তীক্ষ্ণ নজর রাখল কোনির হাবভাব, শোয়া, খাওয়া এবং বিশ্রামের দিকে। প্রতিমাসে একবার রক্তে হেমোগ্লোবিনের মাত্রা পরীক্ষা করে পরিশ্রমের ভার বাড়িয়ে যেতে লাগল। অ্যাপোলোর ছেলেদের সঙ্গে এখন তাকে প্রতিযোগিতা করিয়ে সময় নেয়। ক্ষিতীশ একদিন কাগজে বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে '৭০' লিখে ক্লাবের বারান্দায় দেয়ালে সেঁটে দিল। কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে সে হেসে বলল, ''অত বছর আমায় বাঁচতে হবে কিনা, সেটা যাতে মনে থাকে তাই চোখের সামনে রাখলাম রোজ দেখার জন্য।''

আসলে ওটা হচ্ছে ৭০ সেকেন্ড। সময়টা কোনির চোখে প্রতিদিন ভাসিয়ে রাখার জন্য শুধু ক্লাবেই নয়, বাড়িতেও দেয়ালে লিখে রেখেছে। রমা যোশি এখন লক্ষ্যের পাত্রী। এক মিনিট ১০ সেকেন্ডে কোনিকে এই বছরই সাঁতরাতে হবে।

''অসম্ভব বলে কিছু নেই রে।'' কোনিকে রাত্রে খাওয়ার পর বাড়ির পৌঁছে দেবার সময় ক্ষিতীশ বলে, ''বুঝলি, আমাদের শত্রু হচ্ছে সময়। এই ঘড়িটা।''

ক্ষিতীশ পকেট থেকে স্টপ ওয়াচটা বার করে কোনির চোখের সামনে ধরে। কোনি সেটা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে থাকে। বারবার চাবি টিপে দেখে কাঁটাটা থরথরিয়ে কেমন এগোচ্ছে।

''ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের দিকে এগোতে হলে, ছোটোখাট রেকর্ডগুলো ভাঙতে ভাঙতে এগোতে হবে।''

''ক্ষিদ্দা, অমিয়াদির রেকর্ড কবে ভাঙব?''

ঘড়িটা কানে লাগিয়ে কোনি হঠাৎ প্রশ্নটা করল।

ক্ষিতীশ হেসে বলল, ''কেন!''

''আজ দোকানে এসেছিল ব্লাউজ করাতে। আমাকে সকলের সামনে বলল, তুই এখানে ঝিয়ের কাজ করিস? জানো ক্ষিদ্দা, আমার খুব লজ্জা করল। আমার হাতের লেখাটা এত খারাপ, নইলে খাতায় মাপ লেখার কাজ করতে পারতুম। তুমি বৌদিকে একটু বলবে? আমি রোজ তাহলে হাতের লেখার প্র্যাকটিস করব।''

''বলব।'' ক্ষিতীশ মৃদু স্বরে বলল। ''লজ্জা কখনো পুরোটো জিততে পারবি না। কাউন্টারের ওধারে বসলে খানিকটা জেতা হবে। ক্ষমতা দিয়ে জিততে হয়। তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে। যখন তোর ক্ষমতা খানিকটা বাড়াতে পারবি, শুধু তোর কেন, তখন আমারও মান তাতে বাড়বে, মানুষের মান বাড়বে।''

''মানুষেরও!'' কোনি হকচকিয়ে বলল।

ক্ষিতীশ ওর পিঠে চাপড় দিয়ে ঝুঁকে ভারী গলায় বলল, ''হ্যাঁ, মানুষেরও। মানুষ শব্দের থেকে জোরে আকাশে উড়েছে, দশ সেকেন্ডের কমে ডাঙায় একশো মিটার ছুটছে, জলে মেয়েরা এক মিনিটের বাধা ভেঙেছে। স্বপ্নেও ভাবা যায়নি এমন সব পদ্ধতি লেবরেটরিতে, অপারেশন টেবলে মানুষ শিখছে এই শরীরের আয়ু বাড়াতে। একদিন আসবে যখন আলোর গতিকে মানুষ হার মানাবে, ইচ্ছামতো বয়সটা বাড়াবে। এই যে রেকর্ড ভেঙে মানুষ জলে, স্থলে, আকাশে এগোচ্ছে, এ সবই মানুষের মুক্তির চেষ্টা, এই ঘড়িটার হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। একদিন সব ঘড়ি ভেঙে চুরমার করে দেবে মানুষ, সময়কে হারিয়ে দেবে মানুষ —''

‘‘ক্ষিদ্দা, কাঁধে লাগছে।’’ কোনি অস্ফুটে কাতরে উঠল। কোনির কাঁধে উত্তেজিত আঙুলগুলো চেপে বসে গেছে। ক্ষিতীশ লজ্জা পেয়ে হাতটা নামিয়ে নিল।

‘‘অনেক সময় আবোলতাবোল বকি। তুই এসব কথা বুঝতে পারিস?’’

কোনি মাথা নাড়ল। ক্ষিতীশ যেন তাতে নিশ্চিত হলো, এমন স্বরে বলল, ‘‘তোর পক্ষে এসব শক্ত কথা। তবে আরো বড়ো হ, বুঝতে পারবি।’’

‘‘ক্ষিদ্দা, তুমি কিন্তু বললে না, আমার টাইম অমিয়াদির রেকর্ডের থেকে কত পেছনে।’’

‘‘বলব বলব, একেবারে কম্পিটিশনেই দেখিয়ে দেবো ব্যাটাদের, কে কার পায়ের জল খায়।’’

এর তিনমাস পরই ক্ষিতীশ অ্যাপোলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘‘বদমাইসি, এসব হচ্ছে ধীরেনের বদমাইসি। কোনির এন্ট্রি নেবে না কেন? অ্যাপোলোর সঙ্গে ঝগড়া, তাই বলে সুইমারদের ওপর ঝাল ঝাড়বে! প্রোটেস্ট করো, ইনজাংশন দাও ...যা খুশি ইচ্ছে মতো করবে, এটা কি মগের মুল্লুক!’’

নকুল মুখুজ্জে আর বিষ্টু ধর এবং আরো অনেকে সেখানে বসে। ক্ষিতীশ পায়চারি করছিল, থমকে জুপিটার ক্লাবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘‘কোথায় নেমে গেছে — অপদার্থরা ক্লাবটাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে! এখন ভয়ে ইতরোমো শুরু করেছে। ভেবেছে এইভাবে ক্ষিতীশ সিংগীকে আটকাবে।’’

ফিসফিস করে বিষ্টু ধর বলল, ‘‘এসব বিনোদ ভড়ের পরামর্শে হয়েছে। পাবলিককে এটা জানানো উচিত। প্রেস কনফারেন্স ডাকব আমি।’’

নকুল মুখুজ্জে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

‘‘এন্ট্রি রিফিউজ করার অধিকার ক্লাবের আছে। ওরা বলেছে ডেট পেরিয়ে গেছে তাই নেবে না। লাস্ট ডেট কবে সেটা তো ওরা বলে দেয়নি, সুতরাং আইনের ফাঁক রেখেছে। প্রোটেস্ট, ইনজাংশন কিছুই চলবে না।’’

‘‘এটা মরালিটির ব্যাপার।’’ ক্ষিতীশ অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের বুকে চাপড় দিল। ‘‘এটা খেলার, এটা সাহসের, এটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার।’’

নকুল মুখুজ্জের ঠোঁট বিদ্রূপে মুচড়ে উঠল। বিষ্টু ধর উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘‘তাহলে একটা ডিমনস্ট্রেশন করলে কেমন হয়। বিক্ষোভ প্রতিবাদ জুপিটারের সামনে, বিনোদ ভড়ের বাড়ির সামনে? একটা মিছিলও যদি পাড়ায় পাড়ায় —’’

‘‘ওতে অনেক ঝামেলা।’’ নকুল ঠান্ডা স্বরে বিষ্টু ধরকে মিইয়ে দিল। ‘‘জুপিটারেরই পাবলিসিটি হবে, ওদের ইজ্জৎ একটুও তাতে কমবে না। আপনার ইলেকশন পর্যন্ত লোকে এসব মনেও রাখবে না। তার থেকে বরং অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে। ক্ষিতীশ, তুই কি নিশ্চিত যে, কোনি এখন অমিয়াকে হারাতে পারে?’’

‘‘নিশ্চয়।’’ ক্ষিতীশ বলল দাঁতে দাঁতে চেপে।

‘‘কম্পিটিটরস ফর দ্য লেডিজ হান্ড্রেজ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট, প্লিজ কাম টু দিয়ার স্টার্টিং ব্লকস্।’’

জুপিটার সুইমিং ক্লাবের কম্পিটিশন প্রতিবছরই এই রকম জাঁকালোভাবে হয়। কমলদিঘির অর্ধাংশের চারটে গেট বন্ধ করে, জুপিটারের অংশটুকু টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। কাঠের গ্যালারি তৈরি করা হয় দিঘির তিন-চতুর্থাংশ ঘিরে। সাঁতার শুরু হয় যেদিকের প্লাটফর্ম থেকে, তার পিছনে তিন সারি বিশিষ্ট অতিথিদের চেয়ার এবং তার পিছনেও গ্যালারি। প্ল্যাটফর্মের একধারে টেবিলে। সেখানে মাইক্রোফোন নিয়ে ঘোষক আর জন্য পাঁচেক টাইম রেকর্ডার। বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে, কয়েকটা স্যুভেনির হাতে ধীরেন ঘোষ বিশিষ্ট অতিথিদের তদারকিতে ব্যস্ত। কম্পিটিশনের চিফ রেফারি হরিচরণ।

ভিড়ে আজ ফেটে পড়ছে কমলদিঘি। গ্যালারি ভেঙে কয়েকজন মাটিতে পড়েছে, একজনের হাত ভেঙেছে। রেলিংয়ের ভিতরে পাড় ঘিরে লোক দাঁড়িয়ে। দুটি ছেলে ভিড়ের ধাক্কায় জলে পড়েছিল। অবশ্য তারা সাঁতার জানে। ডাইভিং বোর্ডে উঠেছে বহু ছেলে। জুপিটারের এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ টিনের বেড়ার পরেই অ্যাপোলোর এলাকায়, রেলিং ঘিরে হাজার দুয়েক মানুষ। তারা দূর থেকেই প্রতিযোগিতা দেখবে।

প্রতিযোগিতার আজ শেষ দিন। দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয়েছে। ছেলেদের এবং ছোটো মেয়েদের তিনটি বিষয়ের ফাইনাল হয়ে যাবার পর ঘোষণা শোনা গেল: ‘‘কম্পিটিটরস ফর দ্য লেডিজ হান্ড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট, প্লিজ...। উইল কম্পিটিটরস কাম টু দিয়ার পোজিশনস? দিস ইজ সেকেন্ড কল.....’’

কমলদিঘির অ্যাপোলোর অংশে এতক্ষণ একজন, পাড়ের কাছে মন্থরভাবে সাঁতার কাটছিল। অ্যাপোলের স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মটা জুপিটারেরই পঞ্চাশ মিটার পাশে। সেখানে চুপচাপ বসে চোখে পুরু কাঁচের চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল একটি লোক! কেউ তাকে লক্ষ করছে না। আজ কমলদিঘির আনাচে-কানাচে সর্বত্রই লোক, সকলের চোখ জুপিটারের এলাকার দিকে।

ঘোষণা শেষ হতেই ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

‘‘কোনি!’’ শান্ত নরম গলায় সে ডাকল। জল থেকে কোনি প্ল্যাটফর্ম উঠে এল। রেলিংয়ের ভীড়ের চোখ এদিকে ফিরল।

জুপিটারের প্ল্যাটফর্মে সাঁতারুরা এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয়াকে দেখা গেল হেসে কথা বলছে অতিথিদের মধ্যে বসা এক বৃদ্ধার সঙ্গে। অত্যন্ত ঢিলেঢালা নিশ্চিত ভঙ্গি। বেলা জলে নেমে মিনিট দুয়েক হাত ছুঁড়ে উঠে এল। এখন তোয়ালে দিয়ে জল মোছায় ব্যস্ত। অন্য ছয়টি মেয়ে কিঞ্চিৎ নার্ভাস। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করেই মুখ শুকিয়ে ফেলেছে।

হরিচরণ উত্তেজিতভাবে ধীরেন ঘোষের কানে ফিসফিসিয়ে কী বলল। ধীরেন ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাপোলোর প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। সেটা লক্ষ করে অমিয়াও তাকাল। পাঁচ নম্বর ব্লকের পিছনে দাঁড়ানো কালো কস্ট্যুম পরা মেয়েটিকে চিনতে তার অসুবিধা হলো না। কোনির পাশে ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ। সারা কমলদিঘি হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে, এবার একটা কিছু ব্যাপার হতে চলেছে। চোখ গুলো আপোলোর দিকে নিবন্ধ হচ্ছে।

হরিচরণ কিছু একটা অমিয়াকে বলতেই অমিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল। অ্যাপোলো ক্লাবের বারান্দা থেকে বিষ্টু ধরের চিৎকার ভেসে এল: ‘‘ডাউন দিতেই হবে, কোনি।’’

"অন দ্য বোর্ড।" স্টার্টারের চিৎকার শোনা গেল। এয়ার রাইফেলের নলটা আকাশমুখো তোলা। জুপিটারের ব্লকের উপর আটটি মেয়ে উঠল। অ্যাপোলোর পাঁচ নম্বর ব্লকে উঠেছে কোনি। সারা কমলদিঘি ঘিরে ভেসে উঠল মর্মর শব্দ।

ওরা ব্লকের কিনারে পায়ের আঙুলগুলো আঁকড়ে রেখে হাঁটু ভেঙে, কাঁধ ঝুঁকিয়েছে। দু'হাত পাখির ডানার মতো পিছনে — যেন এখনি উড়বে।

"গেট.. সেট..."

অমিয়া ও কোনি ছাড়া বাকি মেয়েরা ঝপঝপ জলে পড়ল। এয়ার রাইফেলের ক্যাপ ফোটেনি। কমলদিঘি ঘিরে বিদ্রূপ ও আক্ষেপ এক চক্কর ঘুরে গেল। অমিয়া আড়চোখে কোনির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

নতুন ক্যাপ লাগানো হয়েছে।

"অন দ্য বোর্ড।"

মেয়েরা আবার ব্লকের উপর উঠল।

"গেট... সেট...।"

এয়ার রাইফেলে 'ফটাশ' শব্দ হলো।

এক সঙ্গে নয়টি মেয়ে জলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কমলদিঘির উপর গড়িয়ে পড়ল চাপা একটা গর্জন। দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়েছে ফুটবল মাঠের মতো। তাদের চোখ ডাইনে-বামে ৫০ মিটার যাতায়াত করছে আগুয়ান দুটি সাঁতারুকে লক্ষ করতে করতে।

তিরিশ মিটার পর্যন্ত কোনি আর অমিয়া সমান রেখায়। বাকিরা ৭/৮ মিটার পিছনে। এরপর অমিয়া একটু একটু করে এগোতে শুরু করল।

"কোও-ও-নিই।" অ্যাপোলোর দিকে ভীড়ের মধ্যে থেকে কে চিৎকার করে উঠল। "কোও-ও-নিইই।"

"গো, অমিয়া গো।" জুপিটার থেকে চিৎকার শোনা গেল।

ক্ষিতীশ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কোনির দিকে তাকিয়ে। মুখে ভাবান্তর নেই।

অমিয়া দু'হাত এগিয়ে গেছে। বেলা তার পিছনে প্রায় আট মিটার দূরত্বটা সমানে রেখে চলেছে। বাকিদের দিকে কেউ তাকাচ্ছেই না।

অমিয়া সবার আগে ৫০ মিটার বোর্ড ছুঁয়েছে। ঘুরে গিয়ে সে কোনিকে অতিক্রম করার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কোনি যেন থমকে গেল। তারপরই বোর্ড ছুঁয়ে ঘুরেই টর্পেডোর মতো ছিটকে এল।

রোগতপ্ত মানুষের মতো কমলদিঘি ভুল বকতে শুরু করেছে।

''কোও-ও-নিই।''

''এটা ছেলে না মেয়ে, মশাই!''

''মেয়ে মেয়ে, আমাদের ক্লাবের মেয়ে — কোনি।''

''পারবে না। এক বডি পেছনে পড়ে গেছে। কেন যে ক্ষিদ্দা এমন হাস্যকর ব্যাপার করল।''

৬০ মিটার। অমিয়া এগিয়ে চলেছে।

৬৫ মিটার। কোনি উঠছে।

৭০ মিটার। কোনি সমান রেখায় অমিয়ার সঙ্গে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য অমিয়া ঘনঘন হাঁ করছে। পায়ের পাড়ি এলোমেলো হয়ে এসেছে। হাত দুটো উঠছে-পড়ছে যেন নিয়ম রক্ষার জন্য। জলের গভীরে ডুবিয়ে টেনে কোমরের পিছন পর্যন্ত আনার জোরটুকু আর নেই। অমিয়া নিভে আসছে।

''কাম অন অমিয়া, কাম অন বেঙ্গল চ্যামপিয়ন।''

''ফাইট কোনি, ফাইট।''

হঠাৎ কমলদিঘি ঘিরে বিরাট একটা চিৎকার হাউইয়ের মতো আকাশে উঠল। কোনি পিছনে ফেলেছে অমিয়াকে। ওর ছিপছিপে শরীরটার মধ্যে দিনে দিনে সঞ্চিত যন্ত্রণায় ঠাসা শক্তির ভাণ্ডারটিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামা করে চলেছে দুটি হাত, তার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে পা দুটি; ওর দু'পাশে ইংরাজি 'ভি' অক্ষরের মতো ঢেউয়ের রেখা ছড়িয়ে পড়ছে। পায়ের আঘাতে বিরামহীন স্ফীত জলতরঙ্গ ওকে অনুসরণ করছে।

মসৃণ, স্বচ্ছন্দ কিন্তু হিংস্র ভঙ্গিতে কোনি নিজেকে টেনে বার করে নিয়ে গেল। ফিনিশিং বোর্ডে হাত লাগিয়েই সে উদ্বিগ্ন ব্যগ্র চোখে পাশে মুখ ফেরাল। তখনো অমিয়া পৌঁছয়নি। 'উইইই' শব্দে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে কোনি চিত হয়ে বোর্ডে পায়ের ধাক্কা দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আনন্দে।

''তিন বডি, ক্লিয়ার তিন বডিতে মেরেছে।''

''কোওওন্নি.....কোওওন্নি।'' ভীড়ের মধ্যে তিনটি ছেলে তালে তালে সুর করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কোনি হাত নাড়ল তাদের উদ্দেশে।

''কী রকম ডাউন খাওয়াল দেখলে! জুপিটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারই শোধ নিল।''

''অনেকদিন এমন মজা পাইনি কিন্তু!''

হঠাৎ সব আলোচনা, উত্তেজনা থমকে গিয়ে এবার দ্বিগুণ জোরে হৈ হৈ চিৎকার উঠল। হাততালি পড়ছে, শিস উঠছে একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। অ্যাপোলোর স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে এতক্ষণ ধরে প্রস্তরবৎ, ভাবলেসহীন ক্ষিতীশ এখন তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে।

''কোথায় হরিচরণ, মুখখানা একবার দেখা।'' লাফাতে লাফাতে ক্ষিতীশ চিৎকার করে চলল। ''ওলিম্পিকের গুল মেরে কি আর সুইমার তৈরি করা যায় রে পাঁটা? বুদ্ধি যাই, খাটুনি চাই, নিষ্ঠা চাই...গবেট গবেট সব।''

ব্যস্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর ভেলো উঠে এসে ক্ষিতীশকে জড়িয়ে ধরল। ''হচ্ছে কী ক্ষিদ্দা, এত লোকের সামনে, তোমার কি মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি! চলো চলো, ক্লাবে চলো। বিষ্টু ধর ওদিকে একসাইটমেন্টে সেন্সলেন্স হয়ে পড়েছিল। অ্যাই কোনি, উঠে আয়।''

ক্লাবের বারান্দায় বেঞ্চে শুয়েছিল বিষ্টু ধর। ক্ষিতীশকে দেখে ওঠার চেষ্টা করতেই দু'জন তাকে সাহায্য করল।

"দশ কেজি রসগোল্লা আনতে পাঠিয়েছি।" ক্ষীণস্বরে বিষ্টু ধর বলল। "ব্যান্ড পার্টি আনাব। কোনিকে সারা নর্থ ক্যালকাটা ঘোরাব।"

"খবরদার, ও কাজটি করবেন না। তাহলে হাজার পাঁচেক ভোট কমে যাবে।"

বিষ্টু ধর ফ্যালফ্যাল করে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে থেকে, অস্ফুটে আপন মনে বলল, "কিন্তু আমার যে জেনুয়িন আনন্দ হচ্ছে।"

ক্ষিতীশ কোনিকে ডেকে গম্ভীর মুখে বলল, "টার্নিংয়ের ভুল হলো কেন?"

"তখন কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। অমিয়াদি টার্ন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, টাম্বল টার্নের কথা আর মনেই এল না।"

"আসলে নিজের ওপর তখন ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলিস। মনে এলে সময় আরো কমতো।"

"আমার সময় কত হলো ক্ষিদ্দা?"

বুক পকেট থেকে ঘড়ি বার করে তাকিয়েই ক্ষিতীশ ভ্রূ কঞ্চিত করল এবং ক্রমশ মুখটা অপ্রতিভ হয়ে উঠল।

"ভুলে গেছি রে! ফিনিশের সময় এমন একসাইটমেন্ট চারদিকে ..... তবে বেঙ্গল রেরর্ড নিশ্চয় আজ ভেঙেছিস। ইস্‌স, সময়টা যদি রাখতুম।"

"ক্ষিদ্দা, আমায় যে এখন প্রজাপতিতে যেতে হবে, দেরি হলে বৌদি রাগ করবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেরি করিসনি আর।" ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে বলল। কিন্তু কোনি ইতস্তত করছে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কী হলো?"

"কানে কানে বলব।"

ক্ষিতীশ নিচু করল মাথাটা।

"রসগোল্লা আনতে পাঠিয়েছে না!"

"তাই তো! নিশ্চয় ভেলোটা আনতে গেছে। তাহলে আজ আর তোর বরাতে রসগোল্লা নেই।"

"কে বললে নেই।" বিষ্টু ধর গর্জন করে উঠল। "ব্যান্ড পার্টি ঘোরানো গেল না, রসগোল্লার হাঁড়িটাই তার বদলে প্রজাপতি ঘুরে আসবে।"

"তাহলে তোর বৌদির রাগও জল হয়ে যাবে।"

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ক্ষিতীশের প্রতি লীলাবতীর প্রথম উক্তি হলো: "অতলোকের সামনে এই বুড়ো বয়সে ধেই ধেই করে নাচছিলে কেন? লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। সবার সামনে অসভ্যতা, দোকানের মেয়েরাও দেখল তো!"

ক্ষিতীশ মাথা চুলকোতে চুলকোতে কোনির দিকে তাকাল। "তোর বৌদি জানল কী করে?"

ফিসফিস করে কোনি বলল, "বৌদি দেখতে গেছল। আমি বলেছিলুম আজকের সাঁতারের কথাটা, নইলে ছুটি পেতুম না যে।" তারপর হেসে বলল, "বৌদি আমার মাপ নিয়েছে, একটা ফ্রক করে দেবে।" লাজুক স্বরে বলল, "বৌদি বলেছে, ইন্ডিয়া রেকর্ড করলে সিল্কের শাড়ি দেবে।"

কোনিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, "কী মনে হচ্ছিল রে তোর, যখন সাঁতরাচ্ছিলিস।"

কোনি অনেকক্ষণ চুপ করে হাঁটল, তারপর স্বপ্নের ঘোরে যেন কথা বলছে, এমনভাবে বলল, "জানো ক্ষিদ্দা, রোজ যখন প্র্যাকটিস করি, তখন জলের মধ্যে নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখও এগিয়ে চলেছে। বড্ড ভয় করে তখন।"

"মুখটা কেমন দেখতে রে?"

"দাদার মতন। আজও ছিল আমার সঙ্গে।"

অবশেষে কোনি বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল।

এবারের জাতীয় সাঁতার চ্যামপিয়নশিপ হচ্ছে মাদ্রাজে। বি এ এস এ নির্বাচন সভায় ধীরেন ঘোষ, বদু চাটুজ্জেরা প্রবল বিরোধিতা করেছিল অ্যাপোলোর কাউকে দলে নেওয়ায়। শুধু তাই নয়, জুপিটারের কম্পিটিশনে অ্যাপোলোর তরফ থেকে ''অমার্জনীয় অখেলোয়াড়ি আচরণ করার জন্য'' ওই ক্লাবকে সাসপেন্ড করা হোক দাবিও তোলে।

জুপিটার দলে ভারী ছিল, তাদের প্রস্তাব গৃহীতও হচ্ছিল। এমন সময় আচমকা বালিগঞ্জ ক্লাবের প্রণবেন্দু বিশ্বাস অর্থাৎ হিয়ার কোচ প্রস্তাব দিল, ''অ্যাপোলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হোক, ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' প্রণবেন্দু তারপর বলল, ''বেঙ্গলের স্বার্থেই কনকচাঁপা পালকে টিমে রাখতে হবে।''

তুমুল হৈচৈ পড়ে গেল প্রণবেন্দুর এই কথায়। অ্যাপোলোর কোনো প্রতিনিধি সভায় নেই। ওরা ভেবেছিল প্রস্তাবনা বিনা বাধায় পাশ হয়ে যাবে। কেউ ভাবতেই পারেনি হিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ নিয়ে প্রণবেন্দুই কিনা লড়াই শুরু করবে। ধীরেন ঘোষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, ''স্টেট চ্যামপিয়নশিপে কী হলো, সেটা তো তুমি নিজেই দেখেছ।''

''হ্যাঁ দেখেছি।'' প্রণবেন্দু স্থির চোখে ধীরেনের পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, ''কী হয়েছিল আমি দেখেছি।''

শুধু প্রণবেন্দু নয়, আরো অনেকেই দেখেছে।

কোনির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমিয়ার সঙ্গে নয়, হয়েছিল হিয়ার সঙ্গে। ব্রেস্ট স্ট্রোকের ১০০ মিটারে ছিল কোনি, অমিয়া, হিয়া। চ্যামপিয়নশিপের অন্যতম রেফারি ছিল ধীরেন ঘোষ। স্ট্রোক জাজদের মধ্যে ছিল হরিচরণ, ইনসপেক্টর অফ টার্নস এবং টাইম কিপারদের মধ্যে কার্তিক সাহা, বদু চাটুজ্জে, যজ্ঞেশ্বর ভটচাজ ছাড়াও জুপিটারের গোষ্ঠিভুক্ত কয়েকটি ক্লাবের লোকেরা ছিল।

একই সঙ্গে কোনি আর হিয়া ৫০ মিটার থেকে টার্ন নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ নাড়তে শুরু করে। রেফারি ধীরেন ঘোষ ছুটে গিয়ে ফ্ল্যাগ দেখাবার কারণটা জেনে, বলল, ''কনকচাঁপা পাল ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। টার্ন করেই আন্ডারওয়াটার ডাবল-কিক নিয়েছে।''

শুনে অবাক হয়ে গেল ক্ষিতীশ। শুধু বলল, ''এরকম ভুল করার কথা তো নয়।''

হিয়া প্রথম এবং তার থেকে ৬ মিটার পিছনে কোনি ৭ মিটার পিছনে অমিয়া সাঁতার শেষ করে। কোনিকে ২০০ মিটারে নামতে দেয়নি ক্ষিতীশ। ব্রেস্ট স্ট্রোকে পায়ের উপর অত্যধিক খাটুনি পড়ে, অথচ তার পরেই ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট। কোনি মূলত ফ্রি স্টাইলার। কিন্তু এতেও কোনি পারল না। সাঁতার শেষ করে ফিনিশিং বোর্ড ছুঁয়েই সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল অমিয়া হাত ছোঁয়াল। কোনি একগাল হেসে মুখ তুলে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। ঘড়িটা উঁচু করে ধরে গ্যালারি থেকে ক্ষিতীশ হাত নাড়ল। ঘোষণায় শোনা গেল অমিয়া প্রথম হয়েছে।

ক্ষিতীশ প্রথমে থ হয়ে গেল, তারপর ধীরেনের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, ''এসব কী হচ্ছে?''

''কী আবার হবে!'' ধীরেন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষিতীশ ওর হাত টেনে ধরল।

“আমিও টাইম রাখছি। কোনি আগে টাচ করেছে, ওর টাইম —”

“তোমার জাপানি ঘড়ির টাইম তোমার কাছেই রাখো।”

নকুল মুখুজ্জে প্রতিবাদ জানাল জুরি অফ অ্যাপিলের কাছে। প্রতিবাদ নাকচ হয়ে গেল। পনেরো মিনিট পরেই ছিল ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি। কোনি বাটার ফ্লাইয়ে হিয়া এবং অমিয়ার কাছে পিছিয়ে পড়ল, ব্যাক স্ট্রোকে অমিয়াকে ধরে ফেলে টার্ন নিতেই দেখা গেল যজ্ঞেশ্বর ভটচাজ লাল ফ্ল্যাগ তুলে রয়েছে।

“ব্যাপার কী!” ক্ষিতীশ গ্যালারি থেকে নেমে এল। “ধীরেন জোচ্চুরির একটা সীমা আছে। জগু তো আগে থেকেই ফ্ল্যাগ তুলেছিল।”

“কে বলল আগে থেকে! তোমার মেয়েটা ফলটি টার্ন নিয়েছে, তারপর ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে। শেখাও শেখাও, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো শেখাও। জুপিটারকে অপদস্থ করা ছাড়া আর কিছু তো শেখাওনি।” ধীরেন উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বকের মতো গলাটা লম্বা করে বলতে লাগল, “আইনটাও শিখো যে, ব্যাক স্ট্রোকে টার্ন নেবার জন্য বোর্ডে হাত ছোঁয়াবার আগে নরম্যাল পজিশন অন দি ব্যাক থাকতে হবে। কনকচাঁপা ঘুরে গিয়ে হাত ছুঁইয়েছে, নরম্যাল পজিশনে থেকে ছোঁয়ায়নি। যাও যাও, গিয়ে বোসো এখন।”

হিয়ার কাছে অমিয়া হেরে গেল এক সেকেন্ডের তফাতে। কোনি আড়ষ্ট হয়ে গেল দু'বার বাতিল হয়ে এবং প্রথম হয়েও দ্বিতীয় হয়ে যাওয়ায়। বাড়ি ফেরার সময় ক্ষিতীশ বাসে সারা পথ গজরাল এবং অবশেষে বলল, “কাল হানড্রেড মিটার, দেখি ধীরেনরা কী করে তোকে আটকায়।”

কিন্তু আটকাবার যে অনেক পন্থা আছে ক্ষিতীশ তা ভেবে দেখেনি।

পরদিন স্টার্টিং ব্লকে যখন প্রতিযোগীরা এসে দাঁড়াল, ক্ষিতীশ একটু অবাকই হলো। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা সেরা তাদের মাঝখানে রাখা হয়, — ৩, ৪, ৫ নম্বর লেনে। হিয়া ৩ নম্বরে, কোনি ৪ নম্বরে, অমিয়া ৬ নম্বরে আর তাদের মাঝে জুপিটারের ইলা ৫ নম্বর লেনে। হিটে কোনোক্রমে তৃতীয় হয়ে ইলা ফাইনালে উঠেছে। দু' বছর আগে প্রি-ইউ পরীক্ষায় টোকার সময় ধরা পড়ে ইলা গার্ডকে কামড়ে দিয়েছিল।

ক্ষিতীশ এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরেনের দিকে। একজন ভলান্টিয়ার তাকে আটকে দিয়ে বলল “প্ল্যাটফর্মে কম্পিটিটাররা আর অফিসিয়ালরা ছাড়া কেউ যেতে পারবে না।”

ফিরে এসে ক্ষিতীশ ঘড়ি হাতে নিয়ে বসল। শুরু থেকেই প্রচণ্ড রেস। অমিয়া বদ্ধপরিকর চ্যামপিয়নশিপ বজায় রেখে সাঁতার থেকে বিদায় নিতে। হিয়া মসৃণ ছন্দোবদ্ধ এবং দ্রুততালে নিখুঁত ভঙ্গিতে ভেসে যাচ্ছে। কোনি যেন তাড়া খাওয়া ব্যস্ত উদ্বিগ্ন জলকন্যা। জল তোলপাড় করে সে যেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে। বাকিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ওই তিনজনের পিছনে অন্তত ২০ মিটারের মধ্যে থাকতে। ইলার ব্যস্ততাটা একটু কম, সে বরাবর মুখ তুলে তাকাচ্ছে আর ক্রমশই সরে যাচ্ছে কোনির লেনের দিকে।

বোর্ড ছুঁয়ে সবার আগে টার্ন নিল কোনি। তারপর অমিয়া। ব্রেস্ট স্ট্রোকাররা ভালো ফ্রি স্টাইলার হয় না — হিয়া প্রায় দু' মিটার পিছিয়ে পড়েছে। বাকিরা তখনো ৪০ মিটারেও পৌঁছয়নি। টার্ন নিয়ে কোনি সবে মাত্র দু-তিনটি স্ট্রোক দিয়েছে, তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

ইলা ঢুকে পড়েছে কোনির লেনে। দুজনে মুখোমুখি সংঘর্ষ! “উঃ” বলে কোনি চেঁচিয়ে উঠল একবার, দেখা গেল ওরা জড়াজড়ি অবস্থায় এবং হাঁকপাক করে সে যেন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেন্ড এভাবেই কাটল। ততক্ষণে অমিয়া এবং হিয়া ওদের অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। বদু চাটুজ্জে লাল ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে ইলার দিকে তাকিয়ে বলল, “ইউ ডিসকোয়ালিফায়েড।” ইলা আবার নিজের লেনে সরে গিয়ে সাঁতার কেটে স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

কোনি শুধু একবার সামনে তাকিয়ে দেখল। তারপরেই বড়ো হাঁ করে অনেকখানি বাতাস বুকে ভরে নিয়ে তাড়া করল সামনের দুজনকে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু শেষ চেষ্টা। এঞ্জিনের পিস্টনের মতো ওঠানামা করছে দুটো হাত, পায়ের কাছে টগবগিয়ে ফুটছে জল।

''কাম অন পল, কাম অন।'' দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছে আর কেউ নয়, হিয়ার বাবা। গ্যালারির হতভম্ব ভাবটা তাতে যেন ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে পড়ল।

''জোরে জোরে, আরো জোরে!'' শুধু এই চিৎকার ধাপে ধাপে উঠে অবশেষে আক্ষেপে ভেঙে পড়ল। কোনি পারল না। অমিয়া তার খেতাব রক্ষা করল। দ্বিতীয় হলো হিয়া। কোনি তৃতীয় হলো বেলার সঙ্গে।

তারপর আর একটি ব্যাপার ঘটল। ধীরেন জলের ধারে ঝুঁকে এক গাল হেসে অমিয়াকে কিছু বলছিল, সেই সময় ভিড় ঠেলে ছুটে এসে ক্ষিতীশ তার পিছনে লাথি কষাল। ধীরেন উল্টে গিয়ে জলে পড়ল। তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটি ছেলে ক্ষিতীশকে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে। তখন শোনা গেল চিৎকার করে সে বলে যাচ্ছে, ''পারবি না, এভাবে পারবি না।...''

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোনির তোয়ালে দিয়ে ক্ষিতীশ মুখ মুছল। ঠোঁটের কষ বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছে। কোনির কপাল ফুলে উঠেছে। একটা পানের দোকান দেখে ক্ষিতীশ বরফ কেনার জন্য দাঁড়াল। ঠিক তখনই ওর পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হিয়ার বাবা নেমে এল।

''সরি মিস্টার সিন্‌হা। এমন ডার্টি ব্যাপার এখানে হবে আমি জানতাম না। হিয়া, তার মা, আমরা কেউই খুশি হতে পারছি না। এভাবে মেডেল জেতায় কোনো আনন্দ নেই।''

ভদ্রলোক কোনির পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, ''দুঃখ কোরো না। জোরে সাঁতার কাটার দরকারটা আজ তুমি অনুভব করতে পেরেছ, তুমি লাকি। তোমার লাস্ট ফরটি মিটারস আমি ভুলব না।''

ক্ষিতীশ প্রথমে বিভ্রান্ত তারপর অভিভূত হয়ে গেল। গাড়ির জানলা দিয়ে হিয়া এবং তার মা দেখছে। ক্ষিতীশ এগিয়ে এসে হিয়ার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, ''বড়ো হও মা।'' তারপর ইতস্তত করে বলল, ''সেদিন কোনিকে আমি খুব বকেছি।''

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির ছেঁড়া বুক পকেটটা টান মেরে ক্ষিতীশ খুলে ফেলল।

''তোর বৌদিকে এসব কিছু বলিসনি।'' ...

প্রণবেন্দু ঘরের সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ''কী হয়েছিল, আমরা জানি। সেকথা এখন আলোচনা করে লাভ নেই। বাংলার মানসম্মানের কথাই এখন আমাদের ভাবতে হবে, টিমটা যাতে সেরা হয় তার জন্য তুচ্ছ দলাদলি ভুলে যেতে হবে। মহারাষ্ট্রই আমাদের মেয়েদের একমাত্র রাইভ্যাল। ওদের রমা যোশির সঙ্গে ফ্রি স্টাইলে পাল্লা দেবার মতো কেউ নেই, একমাত্র কনকচাঁপা পাল ছাড়া। ফ্রি স্টাইলে তিনটে ইনডিভিজুয়াল, আর একটা রিলে, এই চারটের মধ্যে অন্তত দুটোতে, একশো আর দু'শোয় কনকচাঁপার সিক্সটি পারসেন্ট চান্স আছে।''

''কীসে বুঝলে যে, আছে?'' একজন জানতে চাইল।

''শুধু ওর সেদিনের ফিনিশ করা দেখেই বুঝেছি। যেরকম রোখা জেদি সাঁতার ও দেখাল, তাতে স্প্রিন্ট ইভেন্টে ওর সমকক্ষ এখন বাংলায় কেউ নেই। আমি ওর ট্রেনিংয়ের খবর রাখি, দু-তিনবার দেখেও এসেছি, জোর দিয়েই বলছি মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে চ্যামপিয়নশিপ ছিনিয়ে নিতে হলে এই মেয়েটিকে চাই।''

''শুধু ফ্রি স্টাইল জিতেই আমরা চ্যামপিয়ন হয়ে যাবে?'' ধীরেন ঘোষ তাচ্ছিল্যভরে বলল এবং অন্যান্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো হাসল। কিন্তু তাকে সায় দিয়ে কেউ মাথা নাড়ল না এবার।

''হিয়ার কাছ থেকে আমি তিনটে গোল্ড আশা করছি। দুটো ব্রেস্ট স্ট্রোকে, একটা ব্যাক স্ট্রোকে। মেডলিতেও ফিফটি-ফিফটি চান্স আছে। এছাড়াও অঞ্জু, পুষ্পিতা, বেলা ও অমিয়া পয়েন্ট আনবে। এ বছর আমরা লেডিজ চ্যামপিয়ন হতে পারি।''

‘‘কিন্তু কনকচাঁপা পাল এ বছর কোনো ক্লাব স্পোর্টসে নামেনি, স্টেট চ্যামপিয়নশিপে দুটোতে ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে আর একটায় প্রথম দুটো প্লেসের মধ্যে আসতে পারেনি, বাকিগুলোয় আর নামেনি। ওর টাইমিং কী, আমরা তা জানি না। সুতরাং কী করে ওকে সিলেক্ট করা যায়!’’ ধীরেন ঘোষ টেবল ঘুঁষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল।

কয়েক সেকেন্ড সভাঘর নিস্তব্ধ রইল। সবশেষে ধীর শান্ত গলায় প্রণবেন্দু বলল, ‘‘তাহলে বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের সুইমারদের বাদ দিয়েই আপনাদের টিম করতে হবে। আমার মেয়েদের আমি উইথড্র করে নিচ্ছি।’’

‘‘তা কী করে হয়!’’ সভায় গুঞ্জন উঠল। একজন বলল, ‘‘কনকচাঁপা পালকে সিলেকশন দিলে ক্ষতিই বা কি! যাবে তো নিজের টাকায়।’’

এরপর শুরু হলো তর্কাতর্কি। সেটা পৌঁছল চিৎকারে। এক সময় ধীরেন রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, ‘‘প্রণবেন্দু ব্ল্যাকমেল করে অ্যাপোলোর সুইমার টিমে ঢোকাতে চায়। এতে ওর কী যে স্বার্থ আছে বুঝছি না।’’

প্রণবেন্দু জবাব দিল, ‘‘রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই।’’

কোনি মাদ্রাজ যাওয়ার মনোনয়ন অবশেষে পেল। বাংলা ম্যানেজার হয়েছে ধীরেন ঘোষ। মেয়েদের বিভাগে ম্যানেজার বেলেঘাটা সুইমিং ক্লাবের প্রণতি ভাদুড়ি এবং কোচ হরিচরণ মিত্র। মাদ্রাজ মেলে ওরা সন্ধ্যায় রওনা হবে। ক্ষিতীশ এসেছে ট্রেনে কোনিকে তুলে দিতে। আর এসেছে কান্তি, চন্ডু, ভাদু। কোনির ভাই গোপাল।

কামরায় জানলার ধারে বসেছে কোনি। জানলা থেকে দূরে সবার থেকে একটু তফাতে প্ল্যাটফর্মে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে। কোনি কথা বলছে কান্তিদের সঙ্গে। ধীরেন ঘোষ হাঁকডাক করে তদারকিতে ব্যস্ত। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে, এখনো নাকি কয়েকজন পৌঁছয়নি।

কোনির মুখে চাপা ভয়। কলকাতায় বাইরে সে কখনো যায়নি। সাড়ে চোদ্দোশো কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৩৫ ঘণ্টা ট্রেনে বাস। কামরার আর এক কোণে জুপিটারের অমিয়া আর বেলা। ওরা অভ্যস্ত। এটা ওদের পঞ্চম ন্যাশনাল চ্যামপিয়নশিপ। হিয়া বাবা-মার সঙ্গে দু-দিন পর প্লেনে যাবে।

কোনি কথা বলছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ক্ষিতীশের দিকে। তখন চোখ সরিয়ে নিচ্ছে ক্ষিতীশ।

‘‘মাদ্রাজ একেবারে সমুদ্রের ওপর। তবে নামিসনি যেন। গঙ্গা আর সমুদ্রে অনেক তফাত। সমুদ্রের তলায় কারেন্ট আছে।’’ ভাদু সাবধান করে দিল।

‘‘কোনি মুশকিলে পড়বি খাবার নিয়ে। ইডলি ধোসা যা জিনিস, খেলেই মালুম পাবি। বাঙালিদের পেটে ওসব ঠিক সহ্য হবে না। ওখানে পৌঁছেই খোঁজ করবি বাঙালি হোটেল-ফোটেল কোথায় আছে।’’ কান্তি পরামর্শ দিল।

‘‘না রে আমাদের সঙ্গে রান্নার জিনিসপত্তর, ঠাকুর সব যাচ্ছে।’’

‘‘তোর ভয় কচ্ছে?’’ ভাদু জিজ্ঞেস করল।

কোনি ছলছল চোখে তাকাল।

‘‘আরে ধেৎ, তোর থেকেও কত ছোটো ছোটো মেয়ে ওয়ার্ল্ড ঘুরছে একা। আর তুই তো অ্যাতোগুলো লোকের সঙ্গে যাচ্ছিস। ঘাবড়াসনি।’’ চন্ডু হাত ধরল কোনির।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। ক্ষিতীশ কথা বলছিল একজনের সঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে দেখল। কোনি তার দিকে তাকিয়ে, দু’গাল বেয়ে জল পড়ছে।

‘‘ক্ষিদ্দা।’’ কোনি ধরা গলায় ডাকল।

ক্ষিতীশ না শোনার ভান করল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

''আমার ভয় করছে ক্ষিদ্দা।''

ট্রেনের সঙ্গে হাঁটছে কান্তিরা। মুখ কাত করে কোনি জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল ক্ষিতীশকে, দেখতে পেল না।

ঘণ্টা দুয়েক পর খড়্গাপুর স্টেশনে ট্রেন থামল। কৌতূহলে কোনি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ পাশ থেকে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল ক্ষিতীশ।

''ক্ষিদ্দা!'' কোনির চিৎকারে শুধু কামরারই নয়, প্ল্যাটফর্মেরও অনেকে ফিরে তাকাল।

''মনে আছে তো ঠিক দশটায় ঘুমোবি।''

''না।'' অবাধ্য গোঁয়ারের মতো কোনি ঘনঘন মাথা দোলাল। টপ টপ করে চোখ থেকে জল ঝরছে। ''আমি কিচ্ছু শুনব না, করবও না। তুমি মাদ্রাজ যাবে, এটা আমার কাছে লুকিয়েছিলে কেন?''

একজন টিকিট চেকারকে এগিয়ে আসতে দেখে ক্ষিতীশ আড়ষ্ট হয়ে গেল। লোকটি তার পিছন দিয়ে চলে যাবার পর কোন কামরায় ওঠে, সেদিকে আড়চোখে নজর রাখতে রাখতে সে বলল, ''যাচ্ছি কে বলল, এখান থেকেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব।''

''ইস্‌স্‌।'' কোনি দু' হাতে আঁকড়ে ধরল ক্ষিতীশের পাঞ্জাবির হাতা। ''যাও তো দেখি।''

''কেন আমি যাব! তুই কি কখনো আমার কথা ভাবিস?''

''ভাবি কি না ভাবি, তুমি তা জানো?''

''জানিই তো। জলে ডাইভ দিয়ে পড়ার পরই তো আমাকে ভুলে যাস।''

টিকিট চেকারটি আবার আসছে। কোনি উত্তর দেবার আগেই ক্ষিতীশ, ''কাল সকালে বহরমপুরে আসব'', এই বলেই সরে গেল।

কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হরিচরণ একজনকে বলল, ''আপদটা দেখছি সঙ্গে চলেছে।''

কিন্তু সকালে ক্ষিতীশকে দেখা গেল না। বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য রাত্রেই চেকারের হাতে ধরা পড়ে সে তখন রেল পুলিশের হেফাজতে।

ঘরের একধারে এককোনে খাটে কোনি শুয়েছিল। রং ওঠা শতরঞ্চি আর বালিশ, গায়ে দেবার সুতির চাদর, মাথার কাছে টেবলে ক্যাম্বিসের ছোটো ব্যাগ। তাতে আছে গোটা দুয়েক ফ্রক, আর ওর সব থেকে মূল্যবান সম্পত্তির কস্ট্যুমটা। টেবলে মাজন, ব্রাশ আর অর্ধেক দাঁত পড়ে যাওয়া একটা চিরুনী। খাটের নীচে চটি।

দুই বাহুতে চোখ ঢেকে কোনি শুয়ে, আর অন্যান্য মেয়েরা তখন বাইরে থেকে ফিরল। ওরা মাদ্রাজ শহর দেখতে, বাজার করতে বেরিয়েছিল। কোনি যায়নি, হাতে মাত্র পনেরোটি টাকা, তাই নিয়ে বাজার করা যায় না। শহর দেখার ইচ্ছাও নেই। ওর সঙ্গে কেউ কথা বলে না, হাবেভাবে মেয়েরা বুঝিয়ে দেয় সে ওদের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কোনিও এড়িয়ে চলে ওদের।

আজ আবার সকালে বেরোবার সময়, বেলা হঠাৎ বলে, ‘‘প্রণতিদি, আমাদের সঙ্গে কোনি যাবে না?’’

‘‘না বলছে তো, শরীর খারাপ, জ্বর-জ্বর লাগছে।’’

খাটে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল কোনি।

‘‘তা হলে ঘরে কি ও একা থাকবে! কাল আমার ক্রিমের কৌটোয় খাবলা দেওয়া দেখেছি।’’

‘‘ওম্মা, বেলাদি, আমারও যে পেস্টের টিউবটা অনেকখানি খালি। ভয়ে আমি বলিনি, কি জানি কে আবার কী মনে করবে!’’

‘‘ঘরে তালা দিয়ে যাওয়া উচিত প্রণতিদি।’’

‘‘তাহলে কোনি কোথায় থাকবে!’’ প্রণতি ভাদুড়ির কড়া স্বরে ওরা চুপ করে গেছল।

লজ্জায় আর ভয়ে খাটের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে কোনি শুয়েছিল। থেকে থেকে চাপা একটা অভিমান গুমরে উঠছিল বুকের মধ্যে। ক্ষিদ্দা তাহলে সত্যি সত্যিই খড়্গাপুর থেকে কলকাতায় ফিরে গেল! যদি এখানে সঙ্গে আসত তাহলে কষ্ট অনেক কমে যেত। অনেকের সঙ্গেই তো বাবা-মা এসেছে। ক্ষিদ্দা তাহলে এল না কেন!

হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল হিয়া। ওর বাবা-মা হোটেলে রয়েছে। তারা সকালে এসে হিয়াকে নিয়ে বেরিয়েছিল। ঘরে কাউকে না দেখে হিয়া প্রথমে থমকে গেল। তারপর কোনিকে দেখতে পেয়ে বলল, ‘‘বাবার বন্ধু মিস্টার সারঙ্গপানির বাড়িতে আমি যাচ্ছি, প্রণতিদিকে বলে দিও। ঘণ্টা দুই পরে ফিরব।’’

ঘরের আর একদিকে হিয়ার খাট। সেখানে তার বিরাট স্যুটকেশে অজস্র রকমের জিনিস। ইংরাজি কমিকস্ আর ট্রানজিস্টর রেডিও বিছানায়, খাটের নীচে তিন রকমের জুতো আর চকোলেটের মোড়ক ছড়ানো। হিয়া চটপট ফ্রক বদল করে চুলে ব্রাশ বোলাল। হাত ব্যাগটার মধ্যে একটা চকোলেটের বার দেখতে পেয়ে আধখানা মুখে ঢুকিয়ে বাকিটুকু ভেঙে কোনির দিকে ছুঁড়ে দিল।

টুকরোটা এসে পড়ল কোনির বুকের কাছে। সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল হিয়ার দিকে। হিয়ার গায়ে লাগল।

একটু অবাক হয়ে হিয়া প্রশ্ন করল, ‘‘খাও না তুমি?’’

‘‘দিলেই খেতে হবে নাকি!’’ কোনি শুকনো স্বরে বলল।

চকোলেট টুকরোটা কুড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হিয়া বলল, ‘‘বুঝেছি কেন খাবে না।’’

‘‘কী বুঝেছ?’’ স্প্রিংয়ের মতো কোনি ছিটকে উঠে বসল।

‘‘যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি। তুমি কমপ্লেক্সে ভুগছ, অযথা আমার ওপর রেগে আছ।’’

হিয়া কথা বলতে বলতে বেলার টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রিমের কৌটোটা খুলে আঙুল ডুবিয়ে খানিকটা ক্রিম তুলে গালে লাগাল। ‘‘বাবা বলেছিলেন, রমা যোশি গতবারের মতো ছটা গোল্ড এবার পাবে না যদি স্টেট মিটে যেভাবে হানড্রেড ফিনিশ করেছিল সেইভাবে তুমি কাটতে পারো। কিন্তু আমি বলছি তুমি তা পারবে না।’’

হিয়া আর একটু ক্রিম তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে থমকে গেল। কোনির কাছে এসে, ওর মুখে সেটুকু লাগিয়ে দিয়েই হেসে উঠল সে এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, ‘‘অত হিংসে ভালো নয়।’’

কোনিকে বিভ্রান্ত করল হিয়ার এই কথাটা। আপন মনে সে বলল, ‘বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে। বড়োলোক্‌মি দেখিয়ে চকলেট দেওয়া... কে চায় তোর ভিক্ষে, নিজের জিনিস অন্যকে দিতে হিয়া কার্পণ্য করে না, পরের জিনিস নেওয়াতেও কুণ্ঠা নেই। মুখে ক্রিমটুকু অন্যমনস্কের মতো বুলিয়ে নিয়ে কোনি আবার বলল, ‘এসব হচ্ছে বড়োলোকি চাল। লোককে দেখানো আপন-পর জ্ঞান আমার নেই, বুঝি না যেন কিছু!’

ঘরে ঢুকল হরিচরণ।

‘‘অঃ তুই একা রয়েছিস, ওরা গেল কোথায়? কী ঝামেলা দ্যাখ্‌তো, তোর নাম চারটে ইভেন্টে পাঠান হয়েছিল, অথচ কোনোটাতেই নাম দেখছি না। নিশ্চয় গোলমাল হয়েছে কোথাও। খোঁজ নিয়ে দেখব’খন। অমিয়া ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস তো।’’

যেমন বেগে এসেছিল তেমনিভাবেই হরিচরণ বেরিয়ে গেল। আর থ হয়ে রইল কোনি। এতদূরে এসে চ্যামপিয়নশিপে সে নামতে পারবে না। আর কিছু সে ভাবতে পারল না। আস্তে আস্তে একটা কান্না তার সারা শরীরটাকে ঝাঁকাতে শুরু করল। ফাঁকা, বিরাট ঘরটা একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল মৃদু চাপা করুণ একটা স্বরে। আর তার মধ্যে একটা শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে — ‘‘ক্ষিদ্দা, ক্ষিদ্দা।’’

মেয়েরা ফিরল তর্ক করতে করতে। এবারের ওলিম্পিককে মেক্সিকো না মেক্সিকো সিটি ওলিম্পিক, কোনটা বলা সঠিক হবে। ওরা লক্ষই করল না কোনিকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে সবাই সচকিত হয়ে বেলার দিকে তাকাল। হাতে খোলা ক্রিমের কৌটা, বেলা ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠল, ‘‘আমার ক্রিম! আবার কে নিয়েছে এখান থেকে। কে নিয়েছে? আমি আজ বার করবই, বেরিয়ে যাবার সময় যা ছিল, এখন তার থেকে অনেক কমে গেছে।’’

কে একজন বলল, ‘‘ঘরে তো কোনি ছাড়া আর কেউ ছিল না।’’

অমিয়া হঠাৎ বলল, ‘‘দ্যাখ্ তো কোনির ব্যাগটা, সরিয়ে-ফরিয়ে রেখেছে কিনা।’’

বেলা ছুটে গিয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা খুলে উপুড় করল। সামান্য জিনিস ক’টা মেঝেয় পড়ল। কোনি বিস্ফারিত চোখে

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে। কথা বলার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে, এই ঘটনার আকস্মিকতায়। বেলা পা দিয়ে কোনির কস্ট্যুমটা সরাতেই, ‘‘আহ্’’ বলে সে নিচু হলো কস্ট্যুমটা তোলার জন্য। বেলা সেই মুহূর্তে ওর চুল মুঠোয় টেনে মুখ উঁচু করে ধরল।

‘‘কী মেখেছিস? অ্যাঁ, কী মাখা রয়েছে তোর মুখে?’’ আবিষ্কারের উত্তেজনায় বেলার দম বন্ধ হয়ে এল।

মেয়েরা এগিয়ে এল কোনিকে ঘিরে। অমিয়া একটা আঙুল দিয়ে কোনির গাল ঘষে, আঙুলটা নাকের কাছে ধরে বিচারকের মতো গম্ভীর স্বরে রায় দিল, ‘‘ক্রিম।’’

‘‘আমার ক্রিম।’’ বেলা চিৎকার করে উঠল।

তারপর ওরা সদ্য আবিষ্কৃত একটি দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকা নাবিকদের মতো কোনিকে দেখতে পেল। কোনি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে। মুখের বিস্ময়ভাব কাটেনি তখনো, অসহায় চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে, কিছু বলার জন্য তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু বলতে পারছে না।

‘‘কোনি বোধহয় ফরসা হতে চায়।’’ একজন মন্তব্য করল।

‘‘বাব্বা, আমি যা ভয়ে ছিলুম, বেলাদি বোধহয় আমাকেই চোর সন্দেহ করছে।’’

‘‘আমারও পেস্টও তাহলে কে কমিয়েছে এবার বোঝা গেল।’’

কোনি এতক্ষণে কথা বলল, ‘‘হিয়া ক্রিম বার করে আমার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কখনো ক্রিম মাখি না।’’

‘‘কী বললি? হিয়া?’’ বেলা ঠাস করে কোনিকে চড় মারল। ‘‘হিয়ার নামে অপবাদ দিচ্ছিস? জানিস ও কতো বড়োলোক! তোর মতো দশটা মেয়েকে ও ঝি রাখতে পারে। শেষকালে কিনা হিয়াকেই চোর বানাচ্ছিস!’’

‘‘সত্যি বলছি বেলাদি। আমায় বিশ্বাস করো। হিয়া এসেছিল, আবার বেরিয়ে গেল ওর বাবার বন্ধুর বাড়িতে। চকলেটের আধখানা আমায় দিল আর তোমার ক্রিমের কৌটো থেকে ক্রিম নিয়ে নিজে মাখল আর আমাকেও মাখিয়ে দিল।’’

‘‘গপ্পো লেখ কোনি, তুই মস্তো লেখক হবি।’’ বেলার ধীরস্বরে বিদ্রূপ চাবকে উঠল।

‘‘তাহলে তো একটা দ্বিতীয় ভাগ আগে কিনে দিতে হবে।’’ অমিয়া তার খাটে শুয়ে মিটিমিটি হেসে বলল।

‘‘আমি সত্যি বলছি।’’ কোনির স্বর দুমড়ে মুচড়ে গেল কান্নায়। ‘‘তোমরা বিশ্বাস করো। হিয়া এলে ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।’’

ওরা আর বেশি কথা বলল না। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, ফিসফাস করল কিছুক্ষণ। কোনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠের মতো বসে। প্রণতি ভাদুড়ি আর ধীরেন ঘোষ ঘরে ঢুকল। ওরা যেভাবে কোনির দিকে তাকাল তাতে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা ওদের কানেও ইতিমধ্যে কেউ পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

‘‘হিয়া না আসা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।’’ প্রণতি ভাদুড়ি ঘরের সবাইকে লক্ষ করে বলল। ‘‘যাও, খেয়ে রেস্ট নাও।’’

‘‘অমিয়া, কাল সকালে তোর ফোর আর টু হানড্রেড হিট। যোশি ছাড়া আর কেউ তোর কম্পিটিটার নেই। তা হলেও হিটে টাইম ভালো করতে হবে। বেলা শুনে রাখ, যোশি পড়েছে তোর গ্রুপে। চেষ্টা করবি, পাঞ্জাবের কাউর বলে একটা মেয়ে শুনলাম ভালো টাইম করে এসেছে।’’

ধীরেন ঘোষ প্রত্যেককে নির্দেশ দিতে দিতে শেষকালে কোনির দিকে তাকাল। ‘‘তোর নাম যে কেন বাদ গেল বুঝছি না। বলছে তো পাঠানোই নাকি হয়নি। সব বাজে কথা, নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন এইসব বলছে। আমি অবশ্য প্রোটেস্ট করেছি, দেখি কী হয়। তবে প্র্যাকটিস ঢিলে দিলে চলবে না, ওটা রেগুলার করতেই হবে। মন খারাপ করিসনি, ন্যাশনাল তো বছর বছরই হয়, সামনের বছর আবার আসবি।’’

মেয়েরা খাওয়া সেরে এসে বিছানায় শুয়েছে, এমন সময় হিয়া ফিরল। কোনি না খেয়েই শুয়েছিল, হিয়াকে দেখা মাত্র উঠে বসে চেঁচিয়ে বলল, ‘‘এই তো হিয়া এসেছে।’’

বেলা হাত ধরে হিয়াকে নিজের বিছানায় বসিয়ে বলল, ‘‘আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে। কোনি তোমাকে চোর বলেছে।’’

‘‘হোয়াট!’’ ঝটকা দিয়ে হিয়া উঠে দাঁড়াল দু’চোখে আগুন নিয়ে।

‘‘বোসো বোসো, আগে আমার কথাটা শুনে নাও।’’ বেলা হাত ধরে টেনে হিয়াকে বসাল আবার।

‘‘আমি জানি আমার প্রতি ও জেলাস। কিন্তু এমন নোংরা অপবাদ দেবে ভাবিনি।’’

‘‘আমরাও ভেবেছি নাকি! ক্রিম চুরি করে মুখে মেখে ধরা পড়ে গিয়ে বলেছে তুমি নাকি মাখিয়ে দিয়েছ। এমন বোকার মতো মিথ্যে কথা কেউ বলে!’’

হিয়া থতমত খেয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগটা মাথা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে যে ধাক্কাটা দিচ্ছে তা সামলে উঠে সে বলল, ‘‘ক্রিম তো আমিই ওর মুখে লাগিয়ে দিয়েছি।’’

‘‘য়্যা!’’

‘‘হ্যাঁ তোমার কৌটোটা থেকে আমি মাখলাম, কোনির মুখেও লাগিয়ে দিলাম। কী করব বলো, তোমার পারমিশন নেবার সময় তখন ছিল না। কালও মেখেছিলাম।’’

হিয়া ব্যাপারটা সেখানেই শেষ করে দিয়ে, পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলো। সারা ঘর চুপ। আড়চোখে পরস্পরকে দেখে নিয়ে অনেকেই ঘুমের ভান করল। কোনি একদৃষ্টে হিয়ার দিকে তাকিয়ে। মনে মনে সে বলল, ‘তোমার খেয়ালখুশির জন্য আজ আমি চড় খেয়েছি, খারাপ কথা শুনেছি।’

বেলা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেছল। এখন তার রাগটা পড়ল হিয়ার উপর। বিরক্ত স্বরে সে বলল, ‘‘পরের জিনিস না বলে ব্যবহারটা খুব অন্যায়। তোমার নয় অনেক টাকা আছে, আমার ওই একটুখানি ক্রিম থেকে যদি সবাই মাখে...’’

‘‘আচ্ছা আচ্ছা, নয় তোমায় একটা কিনে দেবো, হয়েছে তো।’’ হিয়া হেসে অপরাধীর মতো মুখ করে হাত জোড় করল। ঠিক সেই সময়ই কোনি ছুটে এসে ওকে চড় মারল।

হিয়া গালে হাত দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। বিছানায় মুহূর্তে সবাই উঠে বসেছে। কোনি ধীর পায়ে নিজের খাটে ফিরে এসে বসল।

‘‘এটা তোমার পাওনা ছিল। বেলাদিকে জিজ্ঞাসা করো, জানতে পারবে। তোমার জন্যই আমি আজ চড় খেয়েছি, চোর বদনাম পেয়েছি।’’ কোনি একটু থেমে আবার বলল, ‘‘তোমাকে আমি একটুও হিংসা করি না। আমি বস্তির মেয়ে, লেখাপড়াও জানি না, তোমার সঙ্গে পারব কেন। তবে একবার কখনো যদি জলে পাই ...’’ দাঁতে দাঁত চেপে বাকি কথাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ায় কিছু শোনা গেল না।

চিপকে সমুদ্রতীরে সুইমিং পুল।

কোনি আগে কখনো এমন পুল দেখেনি। যন্ত্রের সাহায্যে অবিরাম পরিশোধিত স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে পুলের তলদেশ দেখা যায়। একটা পিন পড়ে থাকলেও নজরে আসে। কোনি শুনেছে কলকাতায় সাহেবদের ক্লাবে এমন পুল আছে।

তিনদিকে কাজুবাদাম গাছের ডাল দিয়ে তৈরি হয়েছে গ্যালারি, মাথায় নারকেল পাতার ছাউনি। পাশেই ডাইভিং পুল। পুলের জলে প্রথম নেমে কোনি অস্বস্তি বোধ করেছিল। জলের সঙ্গে পরিচয়ের অনুভব পেতে অবশ্য তার বেশি সময় লাগেনি। হাতে স্টপ ওয়াচ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে নেই অথচ সে সাঁতার কাটছে, কোনি গত একবছর আর তা ভাবতে পারে না। কিন্তু মাদ্রাজে সে জলে নামার আগে পিঠে পরিচিত একটা হাতের স্পর্শ অভ্যাস মতো না পেয়ে মুষড়ে পড়ল। কী ট্রেনিং সে করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। কেউ কিছু বলছে না, দেখিয়েও দিচ্ছে না। হিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত প্রণবেন্দু। হরিচরণের অধিকাংশ নির্দেশ অমিয়ার জন্য। তবু কোনি মোটামুটি জোরে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, কয়েকটা ২৫ মিটার স্প্রিন্ট, আবার ৪০০ মিটার, মিনিট পাঁচেক টার্ন ও স্টার্ট, তারপর ২০০ মিটার মেডলি কাটল।

স্টার্টিং ব্লকে বসে কস্ট্যুম পরা একটি মেয়ে ওদের ট্রেনিং দেখছিল। কোনি জল থেকে উঠে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি হাসল।

"হোয়াটস ইওর নেম?"

"মাই নেম ইজ কনকচাঁপা পাল।"

"ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল স্টাইল।"

কোনি এবার ফাঁপরে পড়ল। ইংরাজিতে জবাব দেওয়ার দায় এড়াবার জন্য সে শুধু হাসল। মেয়েটি আঙুল তুলে হিয়াকে দেখিয়ে বলল, "ইজ শি এ ফ্রি স্টাইলার?"

"কেয়া বোল্‌তা?"

"উও ফ্রি স্টাইলার হ্যায়?"

"হাম হ্যায়। ও হ্যায় ব্রেস্ট স্ট্রোক্‌কা, মেডলিকা। তোমার স্ট্রোক কেয়া?"

মেয়েটি হেসে বলল, "রমা যোশি।"

কোনি এবার ভালো করে তাকাল। শ্যামলা মাজা রং, দোহারা গড়ন। চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতোই দেখতে। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল '৭০' সংখ্যাটা। কোনি দ্রুত ড্রেসিং রুমের দিকে পা চালাল।

বাংলাকে প্রথম গোল্ড এনে দিল হিয়া। পাঁচটির বেশি মেয়ে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতার কাটার জন্য, তাই হিট করার দরকার হয়নি। হিয়া ৩মি ৩২সে সময় নিল।

প্রতিযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারিতে বসেছিল কোনি। দেখল ভিকট্রি স্ট্যান্ডে হিয়া উঠল আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে। ওর গলায় মাদ্রাজের এক মন্ত্রী মেডেল ঝুলিয়ে দিল। ব্যান্ড বাজল। আর তার বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। পুলের ওধারে বসেছে হিয়ার বাবা-মা। ছুটে গেল হিয়া। বাবা জড়িয়ে ধরে চুমু দিল। হিয়াকে কোলে টেনে নিল মা। হিয়া তোয়ালের ক্লোকটা গায়ে দিয়ে ওধারে এল।

''দেখি দেখি মেডেলটা।''

হিয়াকে ঘিরে ধরল মেয়েরা।

''কনগ্র্যাটস হিয়া।''

''থ্যাঙ্কয়ু।''

''দারুণ ফিনিশ করেছে। আমি তো ভাবলুম গুজরাট যেরকম নেক অ্যান্ড নেক যাচ্ছে, টারনিংয়ে যদি হিয়া ওকে না মারতে পারে তাহলে বোধহয় — ''

''আমার শুধু ওই একবারই তখন ভয় হয়েছিল। টারনিংটা আমার এত খারাপ।''

''মাইশোরের মেয়েটাকে দেখেছিস কেমন যেন আগাগোড়াই মুখ তুলে রইল।''

কোনি তফাতেই বসে রইল। হিয়া বারকয়েক গ্যালারিতে চোখ বোলাবার সময় কোনির মুখের দিকে তাকিয়েছিল মাত্র। মেয়েদের একটিই ফাইনাল ছিল, বাকিগুলি ফ্রি স্টাইলের হিট। অমিয়া ফ্রি স্টাইলের তিনটিতেই ফাইনালে উঠেছে, বেলা ২০০ মিটারে এবং হিয়া ১০০ মিটারে। কথা ছিল হিয়া ২০০ ও ৪০০ মিটারেও নামবে কিন্তু প্রণবেন্দু শেষ মুহূর্তে ওর নাম প্রত্যাহার করিয়ে নেয় এই যুক্তিতে যে ওর অন্য ইভেন্টগুলো, যাতে ওর গোল্ড পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে, সেগুলোর ক্ষতি হবে।

তর্ক তুলেছিল হরিচরণ, ''কী এমন ক্ষতি হবে? দুটো ব্রোঞ্জ তো শ্যিওর আসতো, তার মানে বেঙ্গলের দুটো পয়েন্ট। এবার চ্যামপিয়নশিপের জন্য বেঙ্গলের খুব ভালো চান্স রয়েছে। প্রণবেন্দু, তুমি শুধু হিয়ার কথাই ভাবছ, বেঙ্গলের কথাটা ভাবছ না।''

শোনা মাত্র প্রণবেন্দু দপ্ করে উঠেছিল। ''বেঙ্গলের কথা আমি ভাবি না, শুধু আপনারাই ভাবেন! তাহলে মেয়েটা ওখানে বসে আছে কেন?'' প্রণবেন্দু আঙুলটা গ্যালারিতে বসা কোনির দিকে তুলে বলল, ''ও থাকলে বেঙ্গল শ্যিওর চ্যামপিয়নশিপ পেত, কিন্তু আপনারা ক্ষিতীশ সিঙ্গিকে জব্দ করার জন্য ওকে ভিক্টিমাইজ করলেন। আর এখন এসে বাংলার জন্য কাঁদুনি গাইছেন? এবার আমি দেখব আপনার মেয়েরা কী করে, কত পয়েন্ট আনে!''

কোনি জানত না তাকে কেন্দ্র করে দুটো দল পাকিয়ে উঠে ঝগড়া শুরু করেছে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইনাল বিকালে ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইয়ের। অমিয়া আর বেলা পুল থেকে ফিরে এসেই বিছানায়। ধীরেন ঘোষ বিস্কুট আর কমলা লেবু এক হাতে, অন্য হাতে মধু ভর্তি শিশি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

''কাল সকালের জন্য। দুধ দুজনের জন্য দু' গ্লাস রেডি করে রাখো প্রণতি। ঠিক আটটায় পুলে পৌঁছনো চাই। এখন একদম রেস্ট, সাতটার মধ্যে খেয়ে নিয়েই ঘুম।''

যথাসাধ্য নির্দেশ দিয়ে ধীরেন ঘোষ ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল।

''তোমাদের একটা কথাই বলব, প্রথম গোল্ড বাংলা আজ এনেছে। শুভ জয় যাত্রায় আমরা বেরিয়েছি, শেষ গোল্ডও আমাদের, আমরা চ্যামপিয়ন হবেই। মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বাঙালি তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে বাংলার মেয়েরা চ্যামপিয়নশিপ নিয়ে ফিরবে... ফিরবেই। একটা গোল্ড পেয়েছি, বাকি আটটাও আমরা নোব। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না।''

পরদিন দুটি ইভেন্টের দুটিতেই প্রথম হলো রমা যোশি। ২০০ মিটারে অমিয়া ব্রোঞ্জ পেল। রূপো নিল মহারাষ্ট্রেরই নতুন মেয়ে সাধনা দেশপান্ডে। বেলা পঞ্চম স্থান পেল। চিৎকারের গোল্ড মেডেল থাকলে সেটা পেত হরিচরণ। অমিয়া যথাসাধ্য করেছে। কিন্তু গত বছরের থেকে তার সময় ৬ সেকেন্ড কম হলো।

গম্ভীর মুখে অমিয়া জল থেকে উঠে গেল। বেলা ফুঁপিয়ে উঠল কয়েকবার। হিয়া এগিয়ে এসে যোশিকে অভিনন্দন জানাল। এরপর ঘোষণা, ভিকট্রি স্ট্যান্ডে গলায় মেডেল পরা, ব্যান্ডের বাজনা। কোনি উদাস চোখে সব কিছু দেখল মাত্র।

বিকেলে মেয়েরা দল বেঁধে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেল। কোনি পুলেই রয়ে গেল। বাটারফ্লাইয়ে রমার ধারে-কাছে কেউ আসতে পারল না। বাংলার কোনো মেয়ে ফাইনালে নেই। দিল্লি আর গুজরাট বাকি মেডেল দুটি নিল। কোনি নিরুৎসক চোখে সব কিছু দেখল।

শুক্রবার সকালে সোনা জিতল হিয়া আর রুপো পুষ্পিতা ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে। ব্রোঞ্জ গুজরাটের। চ্যামপিয়নশিপের মাঝপথে বাংলার ১৪ ও মহারাষ্ট্রের ১৬ পয়েন্ট, হিয়া ও রমার দুটি করে সোনা। চাপা একটা উত্তেজনা বাংলার ক্যামপে মৃদু কম্পন তুলল। কোনি কোনো কথায় যোগ দিল না।

দুপুরে খেতে বসার আগে ধীরেন ঘোষ এসে বলে গেল, ‘‘বাংলা আবার ভারতের সাঁতারে নিজের জায়গায়’’ — ডান হাতের তর্জনী মাথার উপর তুলে গলা কাঁপিয়ে বলল, ‘‘উঠেছে।’’

হিয়ার ট্রানজিস্টরে রক মিউজিক বাজছিল। প্রণতি ভাদুড়ি রেডিওটা বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে ধমক দিল, ‘‘শোনো শোনো। ইনসপিরেশন পাবে তা হলে।’’

‘‘কিপ আপ দি ফ্ল্যাগ, এখন সমান চলেছে কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাবই।’’

রমা যোশি বিকেলে অমিয়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ১৫০ মিটারে টার্ন নিয়েই এবং অমিয়া যখন শেষবার টার্ন নিচ্ছে তখন সে ৪০০ মিটার শেষ করল। যেন ১০০ মিটারে প্রতিযোগিতা করছে এমন বেহিসাবিভাবে অমিয়া শুরু করে ছিল। সওয়াশো মিটার পর্যন্ত রমা পিছিয়ে ছিল প্রায় ১০ মিটার। তারপরই অমিয়া মন্থর হতে শুরু করে। রমা তার সমান গতিতে কোনো হেরফের না ঘটিয়ে তিনশো মিটারের পর গতি বাড়াল এবং শেষ ৫০ মিটার একা সাঁতরে এল। পাঞ্জাবের মঞ্জিত কাউর ব্রোঞ্জ নিল।

অমিয়া সকলের আগেই ট্যাক্সি করে একা ক্যামপে ফিরে আসে। শনিবার সকালে হিয়ার দুটি হিট, মেডলি এবং ব্যাক স্ট্রোকের। সব মেয়ের চোখ এখন হিয়ার দিকে। গম্ভীর হয়ে গেছে সে। ধীরেন ঘোষ আজ আর বক্তৃতা দিল না। মাথা নেড়ে বলল, ‘‘অমিয়ার মতো ভেটারেনের কাছ থেকে এমন ব্যাডলি জাজড্ রেস কেউ আশা করেনি। আমরা চার পয়েন্টে পিছিয়ে পড়লুম।’’

‘‘হরিচরণদা যদি অমিয়াদিকে একটু বলেও দিত!’’ বেলা ক্ষীণস্বরে বলল।

‘‘যাকগে যা হবার হয়েছে। এখন অনেক কিছু হিয়ার উপর নির্ভর করছে। কাল সকালে দুটো হিট, রাতে মেডলির ফাইনাল। তোমরা ওকে কনসেনট্রেট করতে দাও।’’

ধীরেন ঘোষ চলে যাবার পর সবাই হিয়ার দিকে তাকাল, একমাত্র কোনি ছাড়া।

হিয়া শনিবার সকালের দুটো হিট থেকে অনায়াসেই ফাইনালে উঠল। ব্যাক স্ট্রোকে রমা যোশি নেই। কিন্তু মেডলির দ্বিতীয় হিট থেকে রমা ফাইনালে উঠল হিয়ার সময়কে দুই সেকেন্ড ম্লান করে। ঘোষণায় রমার সময় শোনা মাত্র হিয়া পুল ছেড়ে চলে গেল বাবা-মার সঙ্গে।

মেয়েরা ফিসফাস কথা বলছে। খাটে উপুড় হয়ে রেডিওয় হিন্দি গান শুনছে হিয়া। গত চারদিন কোনির সঙ্গে কারুর বাক্যালাপই হয়নি। অমিয়া কখনো বিছানায় শুচ্ছে, উঠে এসে জানলায় দাঁড়াচ্ছে, টেবলের এটা ওটা নাড়ছে। প্রণতি ভাদুড়ি তার খাটে শুয়ে কমিকস্ পড়ছে।

"অমিয়াদি শুয়ে পড়ো।"

অমিয়া বিরক্তমুখে বেলার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। "ভীষণ মাথা ধরেছে। তখন থেকে রেডিওটা জ্বালাচ্ছে। হিয়া, ওটা বন্ধ করো।"

হিয়া রেডিও বন্ধ করার উদ্যোগ দেখাল না।

"বলছি, রেডিও বন্ধ করো।"

হিয়া একটু জোর করে দিল রেডিওর শব্দ। অমিয়া চিৎকার করে উঠল, "বন্ধ করবে কি করবে না, আমার ভালো লাগছে না।"

"রেডিও শুনতে আমার ভালো লাগছে। হিয়া শুকনো গলায় বলল, "আপনি চেঁচাবেন না।"

কী ঔদ্ধত! অমিয়া অবাক হয়ে ঘরের সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউই তার দিকে তাকিয়ে নেই, এমনকি বেলাও গভীর মনোযোগে রহস্য কাহিনি পাঠে ব্যস্ত। এতদিন বাংলার মেয়ে সাঁতারু মহলে সে সম্রাজ্ঞীর মতো বিরাজ করেছে। এই মুহূর্তে সে বুঝল তার মাথা থেকে মুকুট তুলে নিয়েছে হিয়া। এবার ওকে মধ্যমণি করেই ওরা ঘুরবে ওদের প্রশংসা, মনোযোগ এবার থেকে পাবে হিয়া। তার দিন ফুরিয়ে গেছে। বিছানায় এসে বসল অমিয়া। দিন কি সত্যিই ফুরিয়ে গেছে! কাল আসছে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ৪×১০০ রিলে। দেখা যাক সত্যিই ফুরিয়ে গেছে কিনা, অমিয়া ভাবল, কাল আমাকে দেখাতেই হবে।

কিছু পরে প্রণতি ভাদুড়ি উঠে এসে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। হিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় পুলের হাজার হাজার ওয়াটের আলোয় স্টার্টিং ব্লকের উপর হিয়ার লাল কস্ট্যুম একটি স্থির শিখার মতো অপেক্ষা করছে। তার পাশে রমা যোশি তার পাশে গুজরাটের আমি পটেল। স্টার্টারের বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে জ্বলে উঠল হিয়া।

বাটারফ্লাইয়ে রমার তুল্য ভারতে কেউ নেই। প্রায় দশ মিটারে সে হিয়াকে পিছনে ফেলে গেল শুশুকের মতো ঢেউ খেলানো গতিতে। বোর্ড ছুঁয়েই ব্যাক স্ট্রোক। হঠাৎ গ্যালারি উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। হিয়া এবার ব্যবধান কমাচ্ছে।

গ্যালারি তোলপাড় হতে শুরু করল পুলের জলের মতোই। ব্যাক স্ট্রোকের শেষে রমা তখনো প্রায় চার মিটার এগিয়ে। এবার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং হিয়া জানে এইবারই তাকে বড়ো ব্যবধান তৈরি করতে হবে। এরপরই ফ্রি স্টাইল এবং রমার সঙ্গে এখানে সে পারবে না।

প্রচণ্ডভাবে হিয়ার দুটো হাতের সঙ্গে তাল দিয়ে পা দুটো জলে ধাক্কা দিতে শুরু করল। রমার সঙ্গে পাশাপাশি এসে গেল পুলের মাঝামাঝি এবং এই প্রথম সে রমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। পাশে মুখ ফিরিয়ে হিয়াকে দেখতে দেখতে রমাও জোর বাড়াল।

গ্যালারিতে প্রলাপ চিৎকার শুরু হয়েছে। বাংলার মেয়েরা একসঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে যাচ্ছে 'হিয়া, হিয়া'। শুধু অমিয়া ক্লান্ত ভঙ্গিতে অনুত্তেজিত বসে কোনির পাশে, মুখে পাতলা একটা হাসি নিয়ে। আপন মনেই সে বলল, "হিয়া জিতবে।"

এবং হিয়া জিতল।

ফ্রি স্টাইল শুরু করেছিল হিয়া চার মিটার এগিয়ে থেকে। সেই ব্যবধান থেকে রমা অর্ধেকটা কেড়ে নিল সাঁতার শেষের তিরিশ মিটার বাকি থাকতেই। এবার শুরু হয় দুজনের মধ্যে বাঁচা-মরার লড়াই। ইনচি-ইনচি করে রমা এগিয়ে আসতে থাকে। ফিনিশিং বোর্ডে টাইম কিপাররা ঘড়ি হাতে ঝুঁকে অপেক্ষা করছে। গ্যালারিতে লোকেরা সরে আসছে ফিনিশ দেখার জন্য।

হিয়ার হাত বোর্ড ছোঁয়ার আধ সেকেন্ডের মধ্যেই রমার হাত পৌঁছল।

''বলেছিলুম।'' অমিয়া আবার আপন মনে বলল।

কে জিতেছে জানার জন্য ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো এবং মেয়েরা যখন হিয়াকে জড়িয়ে ধরে নিজেদের চোখের জল তার গালে মাখিয়ে দিচ্ছিল, তখন একমাত্র কোনিই দেখতে পেল, অমিয়ার চোখের কোণে জল।

বাংলা এখনো দু' পয়েন্টে পিছিয়ে। হিয়া ও রমার সোনা তিনটি করে। ধীরেন ঘোষ উত্তেজিত হয়ে রাত্রে খাবার আগে মেয়েদের বলে গেল, ''কাল সকালে আর একটা গোল্ড পাচ্ছে হিয়া! বেঙ্গল এগিয়ে যাবে।''

''ধীরেনদা, ভুলে যাবেন না, তারপরও দুটো ফ্রি স্টাইল ইভেন্ট আছে।'' অমিয়া ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে আনমনে বলল, ''রমা যোশি ইন্ডিয়া রেকর্ড হোল্ড করছে।''

রবিবার সকালে অমিয়া পুলে গেল না। মেয়েরা চিৎকার করতে করতে যখন ঘরে ঢুকল, সে তখন একমনে চিঠি লিখছিল। মুখ না তুলেই বলল, ''হিয়ার তাহলে চারটে গোল্ড হলো।''

''অমিয়াদি, দারুণ ব্যাপার, অঞ্জু একটুর জন্য ব্রোঞ্জ মিস করল।''

''অমিয়াদি, যোশিকে বিট করতে পারবে না?''

''অমিয়াদি, সবাই বলছে এখন তোমার ওপরই চ্যামপিয়নশিপ নির্ভর করছে। বাংলা-মহারাষ্ট্র এখন সমান পয়েন্ট।''

কোনির চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। সে তখন একটা সেফটিপিন দিয়ে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টায় ব্যস্ত। এইসব উত্তেজনা তাকে স্পর্শ করছে না।

অমিয়া লেখা বন্ধ করে বলল, ''চেষ্টা করব।''

জাতীয় সাঁতারের আজ শেষ দিন। সন্ধ্যায় ছ'টি মাত্র অনুষ্ঠান। প্রথমটিই মেয়েদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ফাইনাল। আটজন প্রতিযোগীর মাঝের লেনগুলিতে রমা, অমিয়া, হিয়া। আজ গ্যালারি উপচে পড়ছে। কোনি খালি পায়ে বসে। সেফটিপিনে চটিটাকে চলার যোগ্য করা যায়নি।

অমিয়া বন্দুকের শব্দের আগেই জলে পড়ল। দ্বিতীয়বার ফলস-স্টার্ট নিল মহারাষ্ট্রের সাধনা দেশপান্ডে এবং হিয়া। এরপর একসঙ্গেই আটজন জলে পড়ল বন্দুকের শব্দে। তিরিশ মিটারে দেখা গেল দুজন এগিয়েছে বাকিদের থেকে — রমা ও অমিয়া। তারপরই প্রচণ্ডভাবে নিজেকে বিস্ফোরিত করে অমিয়া পিছনে ফেলল রমাকে। টার্ন নিয়েই সে রমার থেকে এক মিটার এগিয়ে গেছে। রমার কিছুটা পিছনে হিয়া, তার পাশেই সাধনা। হরিচরণ চিৎকার করতে করতে কুঁজো হয়ে পড়েছে।

একটা অস্ফুট কাতরানি শোনা গেল। অমিয়া জলে ভাসছে আর ছটফট করছে পেট চেপে ধরে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত।

''ক্রাম্প, ক্রাম্প ধরেছে।''

জলে লাফিয়ে পড়ল দুজন। ছুটে গেল বাংলার অফিসিয়ালরা। হরিচরণ কপালে হাত দিয়ে বসল। রমা যোশি তখন ফিনিশিং বোর্ড ছুঁয়েছে। তার পিছনে হিয়া এবং সাধনা।

মহারাষ্ট্র তিন পয়েন্ট এগিয়েছে। শেষ ইভেন্ট ৪×১০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতে ১০ পয়েন্ট আনতে না পারলে বাংলার চ্যামপিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। এখন হিয়া ও রমা, দুজনেই চারটি সোনা। পয়েন্টে দুজনেই সমান হয়ে ব্যক্তিগত যুগ্ম চ্যামপিয়ন হয়েছে। রিলের পয়েন্ট টিম পাবে কিন্তু ব্যক্তিগত সোনা পাওয়ায় কে এগিয়ে যাবে, সেটাও নির্ভর করছে এই ইভেন্টের উপর।

আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চ্যামপিয়নশিপের শেষ অনুষ্ঠানের মেয়েদের ৪×১০০ রিলে শুরু হবে। ছেলেদের ফাইনাল এইমাত্র শেষ হলো।

অমিয়া মেডিক্যাল রুমের টেবলে শুয়ে। ঘরের বাইরে ধীরেন ঘোষ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, ''এত কাছে এসে ভরাডুবি হলো। বাংলা তাহলে চ্যামপিয়নশিপটা পেল না। ভাগ্য, ভাগ্য!''

হরিচরণ থমথমে মুখে বলল, ''অমিয়া তো নামতে পারবে না, তাহলে রিলে টিমটা কী হবে? আর ক'মিনিট মাত্র সময় রয়েছে। হিয়া, পুষ্পিতা, বেলা ... ফোর্থ মেয়ে কে হবে?''

''রিজার্ভে আছে অঞ্জু আর — '' ধীরেন ঘোষ থেমে গেল। হরিচরণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে।

প্রণবেন্দু এবং আরো তিন-চারজন ব্যস্ত উত্তেজিত হয়ে হাজির হলো।

''একি, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে! রিলে টিমের কী হবে, আর যে সময় নেই।'' প্রণবেন্দু বলল।

''সেইটেই তো ভাবছি।''

''ভাবাভাবির কিছু নেই, কনকচাঁপা পালকে নামান, অমিয়ার জায়গায়।'' একজন রুক্ষস্বরে বলল।

''কিন্তু—''

''কিন্তু-ফিন্তু কিছু নেই ধীরেনদা। বেঙ্গলের এখনো একটা আউটসাইড চান্স আছে ওকে নামালে। অঞ্জু একদমই পারবে না।''

''আপনারা বসে বসে ভাবুন তাহলে, আমরাই ব্যবস্থা করছি।''
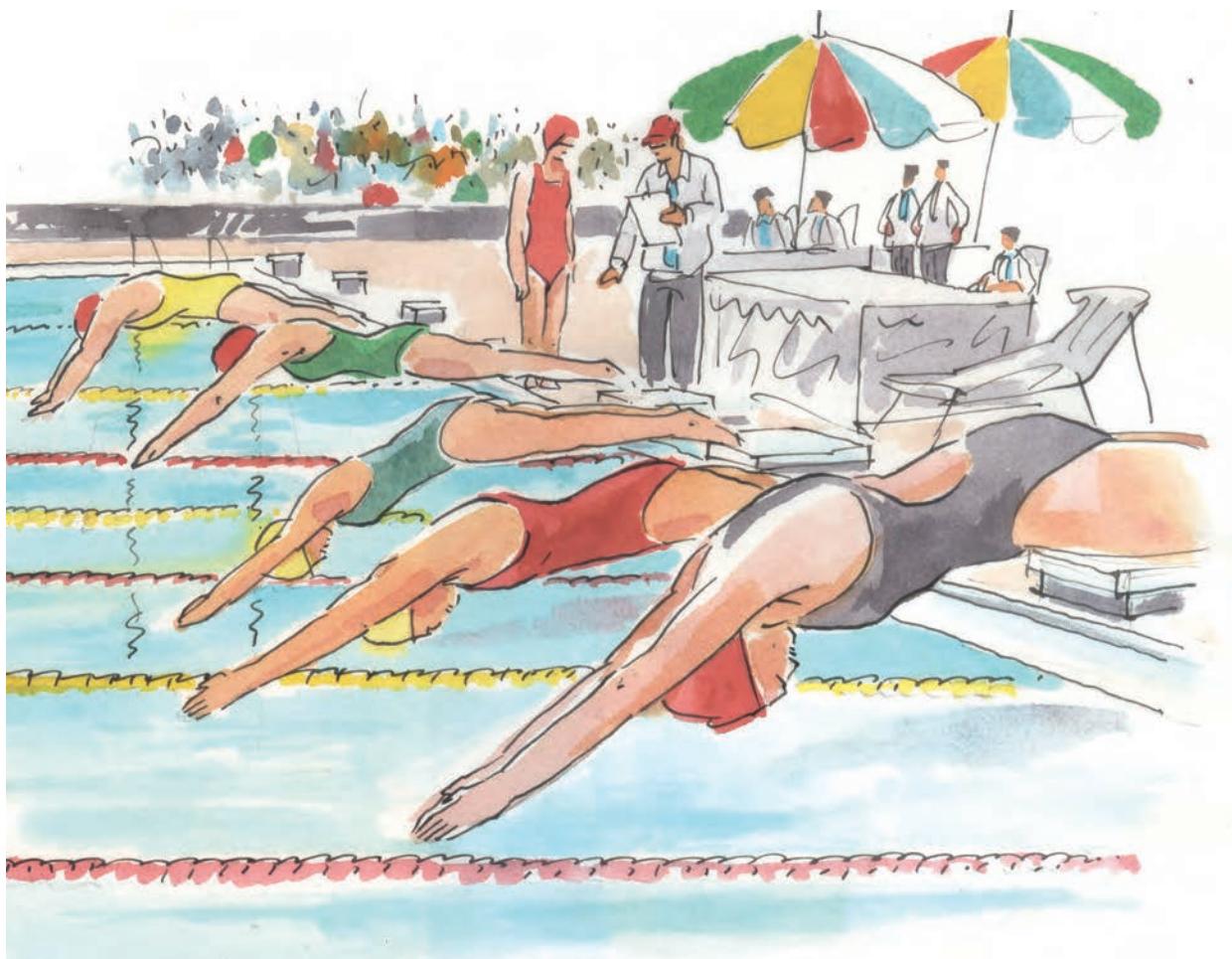
প্রণবেন্দু প্রায় ছুটেই চলে গেল। ধীরেন ঘোষ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আচমকা ঘুম ভাঙা মানুষের মতো অনুসরণ করল প্রণবেন্দুকে। হরিচরণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কোনি যথারীতি গ্যালারিতে বসে। বাংলার মেয়েরা শুকনো মুখে অনিশ্চিত স্বরে নিজেদের মধ্যে ফিশফিস করছে। পুরুষদের মেডলি রিলে ফাইনাল এবার শুরু হবে। প্রতিযোগীরা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে আসছে।

''কোনি, কোনি!''

হাত নেড়ে প্রণবেন্দু এবং আরো কয়েকজন ডাকছে। কোনি বুঝতে পারল না, তাকেই ওরা ডাকল কিনা।

''কোনি, তাড়াতাড়ি, কুইক।''

অবাক হয়ে কোনি তখনো বসে। ধীরেন ঘোষ হাত নাড়ছে তার দিকে। ‘‘কোনি, আর সময় নেই, তোমায় নামতে হবে রিলেতে অমিয়াদির জায়গায়।’’ হিয়া গ্যালারিতে উঠে এসে ওর হাত ধরল।

শিরশির করে উঠল কোনির শরীর।

‘‘আমি!’’

‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। কস্ট্যুম পরে নাও।’’

‘‘না, আমি নামব না।’’ কোনি হাত সরিয়ে নিল।

‘‘বেঙ্গল চ্যামপিয়ন হতে পারবে না।’’

‘‘না পারুক, আমি পারব না।’’

‘‘তুমি বেঙ্গলকে ভালোবাস না?’’

‘‘না, বাসি না।’’ কোনি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। বুকের থেকে উঠে আসা একদলা অভিমান ওর কণ্ঠে আটকে গেল। ‘‘ভালোবাসতে হয় তুমি বাসো। আমি গরিব, আমাকে দেখতে খারাপ, লেখাপড়া জানি না, কত কথা শুনলুম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। জোচ্চুরি করে আমাকে বসিয়ে রেখে এখন ঠেকায় পড়ে এসেছ আমার কাছে —’’

হিয়া ঝুঁকে কোনির দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দাঁত চেপে চাপাস্বরে বলল, ‘‘আমি নিজের জন্য আসিনি। বেঙ্গলের হয়েই তোমাকে ডাকতে এসেছি।’’

‘‘না। এসেছ নিজের জন্য। তুমি নিজের জন্য আর একটা গোল্ড চাও, রমা যোশিকে — ’’ কোনি থেমে গেল।

চড় মারার জন্য হিয়ার হাতটা উঠছে। কোনিও হাত তুলেছে। ছোরার মতো চারটে চোখের প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ল। ধীরস্বরে হিয়া বলল, ‘‘কোনি তুমি আনস্পোরটিং।’’

‘‘কী বললে?’’ ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো কোনি উঠে দাঁড়াল। ‘‘আমি কস্ট্যুম আনিনি।’’

‘‘আমার একস্ট্রা আছে।’’

অ্যামপ্লিফায়ারে ঘোষণা হচ্ছে, এবার শেষ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। মেয়েদের টিম চ্যামপিয়নশিপ নির্ধারিত হবে এই রিলে সাঁতারেই। একে একে টিমের নাম পড়া হচ্ছে। পুলের প্রধান ফটকে এই সময় একটা হৈ চৈ উঠল। একটা পাগলা লোক তিরের মতো দৌড়ে পুলিশ ও ভলান্টিয়ারদের ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাকে তাড়া করেছে দু-তিনজন। প্রতিযোগীরা জলে নেমে শরীর ভিজিয়ে উঠে এসেছে। এখন তোয়ালেতে গা মোছায় ব্যস্ত। হিয়ার হাত থেকে তোয়ালটা টেনে নিল কোনি।

‘‘অন দা বোর্ড।’’ স্টার্টারের গলা শোনা যেতেই সারা পুলে ঝপ্ করে স্তব্ধতা নেমে এল। ব্লকের উপর উঠেছে মহারাষ্ট্রের সাধনা, পাঞ্জাবের মঞ্জিত, বাংলার হিয়া, এবং আরো দুটি মেয়ে। পাঁচটির বেশি টিম হয়নি।

‘‘গেট সেট...’’

নিখুঁতভাবে জলে পড়ল হিয়া ও সাধনা। পুলের গ্যালারিতে মর্মরধ্বনি ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করল যখন হিয়া আগাগোড়া সাধনাকে পিছনে রেখে পুষ্পিতাকে তিন মিটার আগুয়ান থাকার সুবিধা দিল।

কিন্তু পুষ্পিতা এই সুবিধাটা ৫০ মিটারের বেশি ধরে রাখতে পারল না। মহারাষ্ট্রের লিন্ডা ডিসুজা তাকে অবহেলায় দুই লেংথে পিছনে ফেলল। ব্লকের উপর দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত বেলা দেখল তার পাশের লেনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহারাষ্ট্র।

ব্লকের পিছনে দাঁড়ানো হিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, ‘‘বেলাদি অল আউট ... বেলাদি লড়ে যাও।’’

বেলা লড়ে গেল। সাধ্যের থেকেও নিজেকে বাড়িয়ে বেলা সাঁতার দিল। যেকোনো দিন, যেকোনো সময় দীপ্তি কারমারকার অন্তত চার লেংথে বেলাকে পিছনে ফেলবে। কিন্তু আজ বেলারই দিন। দীপ্তি দু’লেংথের ব্যবধানটা এক ইঞ্চিও বাড়াতে পারল না। বেলা যে এই ফারাকটা বজায় রাখতে পারবে, বাংলার কেউ আশা করেনি।

হিয়া হাতটা চেপে ধরেছে কোনির। একটা মোটর এঞ্জিন স্টার্ট নেবার চেষ্টায় থরথর করে উঠেই আবার থেমে যাচ্ছে। এমনভাবে কোনির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একদৃষ্টে সে জলে বেলার দিকে তাকিয়ে। স্টার্টিং ব্লকে ওঠার জন্য সে যখন পা তুলতে যাবে তখন —

‘‘কো ও ও ও নিইইই!’’

পা-টা নেমে এল

‘‘কো ও ও নিইইই!’’

তিন দিকের গ্যালারি সাঁতার থেকে একবার চোখ ফেরাল। পুলের পাশে দু-তিনটি ভলান্টিয়ারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ময়লা পাঞ্জাবি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পুরু লেন্সের চশমা পরা একটি লোক।

‘‘ফাইট, কোনি ফাইট।’’

বক্‌সিংয়ের ভঙ্গিতে দুটো হাত চালাচ্ছে, ‘‘ফাইট, কোওওনিই।’’

একটা আট সিলিন্ডার এঞ্জিনে হঠাৎ যেন স্পার্ক প্লাগ থেকে বিস্ফোরণের বার্তা পৌঁছেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল কোনি। চমকে হাতটা টেনে নিল হিয়া।

‘‘ক্ষিদ্দা!’’

হিয়া ঠেলে দিয়ে বলল, ‘‘কোনি ওঠো, কুইক্।’’

ব্লকে উঠতে উঠতে কোনি বলল, ‘‘ক্ষিদ্দা এসেছে।’’

রমা যোশি জলে পড়ল। তিন সেকেন্ড পর কোনি।

পুলে যদি জলের বদলে মাটি থাকত তাহলে বলা যেত একটা কালো প্যান্থার শিকার তাড়া করেছে। কোনির শিকার টাইম-কিপারদের হাতের ঘড়ি।

তিরিশ মিটার পর থেকেই দর্শকরা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তারা নিশ্বাস ফেলার সময়টুকু দিতেও ভুলে গেল। গলার স্বর নেই। পলক পড়ছে না। গ্যালারির বহু লোক নেমে এসে পুলের ধারে দাঁড়িয়েছে। ভলান্টিয়াররাও।

জলকণায় তৈরি একটা আচ্ছাদনের ঘেরাটোপের মধ্যে কোনি যেন অশরীরী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। টার্নিংয়ের পরই দেখা গেল সে রমা যোশির পাশে। বিপদ এসে গেছে, এটা বুঝতে পেরেছে যোশি। জোর দিল সে। কোনি তবুও পাশে। আরো চল্লিশ মিটার পাশাপাশি রইল ওরা।

এরপরই অবরুদ্ধ উত্তেজনা ফেটে পড়ল পুলের চারধারে। কোনি প্রায় এক হাত এগিয়ে এসেছে। আর দশ মিটার বাকি। রমা বুকে বাতাস ভরে জলের উপর যেন লাফিয়ে উঠল হাতের প্রচণ্ড টানে।

চারিদিকে অন্ধকার, কোনি কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা তার শরীরকে কামড়ে ধরেছে। সেটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে বারবার নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার থেকে বেরোবার জন্য দাপাদাপি করছে তার শরীর। একটা শেষ চেষ্টা তাকে মরিয়া করে তুলল।

‘‘কো ও ও নি ই ই!’’

দীর্ঘ সুরেলা ধ্বনি জলের উপর দিয়ে ভেসে কোনির শরীরে মৃদু মৃদু আঘাত দিল। শিশু যেমন হাত বাড়িয়ে, দীর্ঘ অদর্শনের পর, মাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইভাবে তার হাত সে বাড়াল এবং বোর্ড স্পর্শ করল। রমা যোশির আগেই।

হিয়া আর বেলার হাত ধরে কোনি জল থেকে উঠেই টলে পড়ছিল, ধীরেন ঘোষ জড়িয়ে ধরল। ছুটে আসছে বাংলার মেয়েরা। রমা যোশি ক্লান্ত হাত কোনির পিঠে চাপড়ে দিয়ে গেল। কোনি চোখ বন্ধ করে হাঁফাচ্ছে। ওকে ঘিরে একটা ভীড় বৃত্ত রচনা করেছে। অভিনন্দন আর আদরে সে ডুবে যাচ্ছে।

এরপর ভিকট্রি স্ট্যান্ডে। একে একে গলায় মেডেল পরা, ব্যান্ড বাজনা। গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে কোনি পুলের ধার দিয়ে ফিরতে ফিরতে থমকে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ পিটপিট করে তাকিয়ে। মুখে দশ-বারো দিনের দাড়ি। শরীরটা আরো শীর্ণ হয়ে গেছে।

"কোথায় ছিলে?"

"বল তো কোথায় ছিলুম!"

কোনির ঠোঁট দুটি থরথর করে উঠল। জলে ভরে আসছে দু'চোখ। মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

"মুখ্যুরা তোর টাইমটা রাখেনি, রাখলে দেখতে পেত... কী পেত বল তো?"

কোনি কথাগুলোকে অগ্রাহ্য করে রেগে উঠল। "কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি? খালি বল তো আর বল তো!"

"কোথায় ছিলুম জানিস্, ওইখানে।" কুঁজো হয়ে ক্ষিতীশ ডানহাতের তর্জনীটা তুলে পুলের জলের দিকে দেখাল। "ওই জলের নীচে লুকিয়ে ছিলুম আর বলছিলুম — সব পারে, মানুষ সব পারে... ফাইট কোনি, ফাইট।"

"মিথ্যুক, মিথ্যুক।" কোনি ছুটে এসে ক্ষিতীশের বুকে দুমদুম ঘুসি মারতে শুরু করল। "কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু শুনিনি। যন্ত্রণায় তখন আমি মরে যাচ্ছিলুম।"

"ওইটেই তো আমি রে, যন্ত্রণাটাই তো আমি।"

বলতে বলতে ক্ষিতীশ হা হা শব্দে দরাজ গলায় হেসে উঠল। তখন অনেকেই তাদের দিকে তাকাল এবং দেখল পাগলাটে একটা লোকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপাচ্ছে — যে মেয়েটি এইমাত্র আশ্চর্য সাঁতার দিল, আর তার মাথায় টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে।

নতুন প্রশ্ন-কাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নের নমুনা

কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটির মান ৫) :

১. ‘আজ বারুণী।’ — ‘বারুণী’ তিথিতে গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য ‘কোনি’ উপন্যাসে কীভাবে ফুটে উঠেছে?

২. ‘বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হাত পনেরো দূরের একটা লোক।’ — লোকটি কীভাবে বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল?

৩. ‘ক্ষিদ্দা, তোমার এই লেকচার দেবার বদ অভ্যেসটা ছাড়ো।’—কে, কেন ক্ষিদ্দাকে একথা বলেছিল?

৪. ‘আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই। সেগুলো জানতে চাই।’ — বক্তাকে এর উত্তরে কী জানানো হয়েছিল?

৫. ‘রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা।’ — ‘কোনি’ উপন্যাস অবলম্বনে সেই প্রতিযোগিতার বিবরণ দাও।

৬. ‘ক্ষিতীশ এগিয়ে গেল কোনির দাদাকে লক্ষ করে।’ — এই পর্বে কোনির দাদার সঙ্গে ক্ষিতীশের কথোপকথন নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৭. ‘কিন্তু কোনি পাশ করেও ভর্তি হতে পারল না।’ — কোনি কোথায় ভর্তি হতে পারেনি? তাকে ঘিরে চক্রান্তের আবহ রচিত হয়েছিল কেন?

৮. ‘কোনি আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল।’ — কোন্ পরিস্থিতির কথা উদ্ধৃতাংশে ফুটে উঠেছে?

৯. রাগে চিৎকার করে উঠল ক্ষিতীশ, ‘‘পারতেই হবে, পারতেই হবে। কোনো কথা শুনব না।’’ — প্রশিক্ষক ক্ষিতীশের একরোখা জেদ কীভাবে কোনিকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল, তা আলোচনা করো।

১০. ‘আমি ঠিক মডেলে এনে দেব তোমায়।’ — কোনি কাকে একথা বলেছিল? তার সংকল্প কীভাবে সত্যি হয়েছিল?

১১. ‘এরপর ক্ষিতীশ লক্ষ করল কোনি জল থেকে উঠতে দেরি করছে।’ — কোন ঘটনার ফলশ্রুতির কথা উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে?

১২. ‘মানুষের মান বাড়বে।’ — কখন মানুষের মান বাড়বে বলে বক্তা মনে করেন?

১৩. ‘অনেকদিন এমন মজা পাইনি কিন্তু।’ — কোন ঘটনা বক্তার জীবনে মজা নিয়ে এসেছে?

১৪. ‘তুমুল হৈ চৈ পড়ে গেল প্রণবেন্দুর কথায়।’ — কোন্ কথা প্রণবেন্দু বলেছিলেন? তার পরিণতি কী হলো?

১৫. ‘কিন্তু সকালে ক্ষিতীশকে দেখা গেল না।’ — ক্ষিতীশকে কোথায় দেখা গেল না? এর কারণ কী?

১৬. ‘এটা তোমার পাওনা ছিল।’ — বক্তা কোন্ পাওনা কীভাবে মিটিয়ে দিয়েছিল?

১৭. ‘মেয়েদের টিম চ্যামপিয়নশিপ নির্ধারিত হবে এই রিলে সাঁতারেই।’ — সেই সাঁতারে কোনির অতুলনীয় সাফল্যের যে ছবি উপন্যাসে রয়েছে, তার বিবরণ দাও।

১৮. ‘সব পারে, মানুষ সব পারে ...’ — মানুষের সব পারার কথা ‘কোনি’ উপন্যাসে কীভাবে বিধৃত রয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও।

১৯. ‘ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত।’ — ক্ষিতীশ সিংহের এই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?

২০. ‘এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক।’ বুকের মধ্যে কী পুষে রাখার কথা এখানে বলা হয়েছে? ক্ষিদ্দা কেন এই পুষে রাখার কথা ভাবছেন?

২১. দারিদ্র্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনির যে লড়াই তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।